Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কারবালার সঠিক ইতিহাস

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মারিয়া আক্তার

রোলঃ 228020516

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কারবালার সঠিক ইতিহাস

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মারিয়া আক্তার

রোলঃ 228020516

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কারবালার সঠিক ইতিহাস " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মারিয়া আক্তার, আইডিঃ 228020516 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কারবালার সঠিক ইতিহাস " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

মারিয়া আক্তার

(স্বাক্ষর)

মারিয়া আক্তার

আইডিঃ 228020516

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

ইসলামি খিলাফত 5

ইসলামি খিলাফতের দুর্যোগকাল 6

একটি ভ্রান্তি নিরসন 7

ইয়াযিদের নামে বাইয়াত 9

খলিফা মুআবিয়ার মক্কা ও মদিনা সফর 10

বাইয়াত হবে না হিজাযবাসী 12

খলিফা মুআবিয়ার চির বিদায় 13

ইয়াযিদের শাসনামল 13

ইয়াযিদের প্রথম খুৎবা 14

বাইয়াতের জন্য বার্তাবাহক প্রেরণ 14

হযরত হুসাইন রাঃ ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত হননি কেন? 15

ইয়াযিদের রাজনৈতিক প্রথম ভুল পদক্ষেপ 16

আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের এবং হুসাইন রাঃ এর মদীনা থেকে মক্কা রওনা 17

হুসাইন রাঃ এর মদীনা রাঃ এর সাথে সাক্ষাৎ 18

হুসাইন রাঃ এর আন্দোলনের আসল রহস্য 19

ইয়াযিদের শাসন এবং হুসাইন রাঃ এর বাইয়াত হতে অস্বিকৃত 20

মদীনায় ধরপাকড় এবং ওলীদ বিন উতবাকে বরখাস্তকরণ 22

হযরত হুসাইন রাঃ ইরাক যাবার সংকল্প কেনো করলেন? 23

নেতৃস্থানীয় এবং মুরুব্বীগণ ইয়াযিদের হাতে কেন বাইয়াত হলেন? 24

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ এবং আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ এর ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত .. 26

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের প্রতি ইয়াযিদের পত্র 27

হযরত হুসাইন রাঃ এর নামে কুফার শিয়াদের পত্র 28
মুসলিম বিন আকীল কুফায় 31
মুসলিম বিন আকীলের আশ্বাসমূলক পত্র প্রেরণ 32
হযরত হুসাইন রাঃ এর কুফায় যাবার প্রস্তুতি 33
হযরত হুসাইন রাঃ এতো বাঁধার পরও কেন থামলেন না? 35
কুফায় অবস্থার পরিবর্তন ও আব্দুল্লাহ বিন যিয়াদের নিয়োগ 36
মুসলিম বিন আকীলকে হত্যা 36
হুসাইনের বিরুদ্ধে ইবনু যিয়াদের প্রস্তুতি 38
হুসাইনের দূতের বীরোচিত শাহাদাত 38
আব্দুল্লাহ ইবনু মুতির সাক্ষাৎ 39
হুসাইনি বাহিনীর পরামর্শসভা 40
ইবনু আকিলের শাহাদাতের প্রতিশোধ 40
সাথিদের ফিরে যাওয়ার অনুমতি 41
হুর ইবনু ইয়াযিদের সেনাবাহিনী 42
হুসাইনের পেছনে শত্রুপক্ষের সালাত 43
ময়দানে হুসাইনের দ্বিতীয় ভাষণ 44
হুর ইবনু ইয়াযিদের সত্য-স্বীকার 45
ময়দানে হুসাইনের তৃতীয় ভাষণ 46
যুদ্ধের ময়দানে তিরমাহ ইবনু আদি 48
তিরমাহ ইবনু আদির প্রস্তাব 48
হুসাইনের স্বপ্নে মৃত্যুর দেখা 49
আলি আকবরের ঈমানি দৃঢ়তা 50
আমি যুদ্ধ শুরুর পক্ষে নই 51
উমার ইবনু সাদের আগমন 52

হুসাইন যেন পানি না পায়.....52
মুখোমুখি উমার ও হুসাইন.....53
হুসাইনের তিন প্রস্তাব.....53
ইবনু যিয়াদের সম্মতি, শিমরের বিরোধিতা.....54
উমারকে ইবনু যিয়াদের চিঠি.....55
হুসাইনের স্বপ্নে নবিজি.....56
পরিবারের সামনে হুসাইনের ভাষণ.....57
হুসাইনের সঙ্গী হুর ইবনু ইয়াযিদ.....58
দুই বাহিনীকে হুসাইনের সম্ভাষণ.....59
হুসাইনের হৃদয় তড়পানো ভাষণ.....59
বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা.....62
তুমুল যুদ্ধে যুহরের সালাত.....64
শহিদি কাফেলার বীর সেনারা.....64
ঝরে গেল জান্নাতি ফুল.....66
কেটে ফেলল মাথা.....67
লাশের সাথে শত্রুতা.....68
যত প্রাণ হলো কুরবান.....68
ইবনু যিয়াদের দরবারে হুসাইনের মাথা.....68
নবি-পরিবারের সাথে ধৃষ্টতা.....69
ইয়াযিদের দরবারে হুসাইনের মাথা.....72
প্রাসাদজুড়ে শোকের মাতম.....74
হুসাইন-পত্নীর শোক ও মৃত্যু.....75
বায়ুমণ্ডলে শাহাদাতের প্রভাব.....76
হুসাইনের বৃত্তান্ত ও মর্যাদা.....77

হুসাইনের সোনালি উপদেশ....................78
ধ্বংস হলো ইয়াযিদ....................79
হুসাইনের শাহাদাতের মূল লক্ষ্য....................80
কিছু কথা....................81
উপসংহার....................83

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর। জান্নাতি যুবকদের নেতা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় দৌহিত্র হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু যিনি নবিজির আদর্শের অনুসরণ করতে গিয়ে কারবালা প্রান্তরে শহীদ হয়েছেন। তার এবং তার সাথিদের শাহাদাতের ঘটনা এত মার্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক, যা কখনো ভুলবার নয়। মুসলিমদের তো অবশ্যই এমনকি অমুসলিমদের মনেও কারবালার ঘটনা গভীরভাবে দাগ কাটে। কিন্তু এই কারবালার প্রকৃত ঘটনা অনেকের অজানা। বরং কারবালা সম্পর্কে তারা এমন সব কাহিনি জানে যেগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। তাই কারবালার প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে প্রতিটি মুসলিমদের জানা থাকা জরুরি। পৃথিবীর প্রতিটা ইতিহাস থেকেই আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। ভবিষ্যতকে সুন্দর করতে পূর্ব ইতিহাস জানা জরুরি। আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনুল কারিমের বড় একটা অংশজুড়ে বিভিন্ন ঘটনা ও নানা জাতির ইতিহাস তুলে ধরেছেন। কুরআনুল কারিমের খন্ড খন্ড ইতিহাসের মধ্যেই রয়েছে আমাদের জন্য শিক্ষার ভরপুর উপকরণ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নয়নমণি হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের ঘটনা কেবল ইসলামি ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়, বরং এর মধ্যে রয়েছে পুরো পৃথিবীর ইতিহাসকে নাড়িয়ে দেওয়ার তাৎপর্য। কারবালার ঘটনায় একদিকে যেমন ছিলো বিশ্বাসঘাতকতা, অন্যায়, জুলুম, অত্যাচার, নির্মমতা তেমনি অপরদিকে ছিলো হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর এবং তার সাথিদের সাহসিকতা, অবিচলতা ও অত্মত্যাগ। মনে রাখা জরুরি, কারবালার ঘটনা কোনো গল্প - কাহিনি নয়। বরং তা এমন একটা হৃদয়স্পর্শী ঘটনা যা প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটায়।

ইসলামি খিলাফত

খিলাফত এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা মহানবী হজরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিশনের প্রতিনিধিত্ব করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'য়ালার হুকুমে পুরো পৃথিবীতে ইসলামি খিলাফতের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে যান। মহানবী হজরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বারা আরব গোত্র ও গোষ্ঠীগুলোকে একত্রিত করে মহান জাতিতে পরিণত করেন।মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু একটি কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠাই করেন নি বরং প্রশাসনিক ব্যাবস্থাপনা

এবং বিচার বিভাগীয় সমস্ত ক্ষমতার প্রকৃত রুপরেখা নির্ধারণ করেন। শরিয়তের উপর ভিত্তি করে তিনি যে প্রশাসনিক ব্যাবস্থা প্রবর্তন করেন তা-ই পরবর্তীকালে খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় অনুসৃত হয়। নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর চারজন খলিফা হযরত আবু বকর(রা),হযরত ওমর আল খত্তাব(রা),হযরত ওসমান(রা)এবং হযরত আলী(রা.) পর্যায়ক্রমে ত্রিশ বছর ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এ সময়ে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের রাজনৈতিক, ধর্মীয়,সামাজিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়।

ইসলামি খিলাফতের দুর্যোগকাল

মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলিফা উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের মধ্য দিয়ে খুলে যায় ফিতনার দুয়ার। মুসলিম উম্মার উপর আপতিত হয় একের পর এক বিপদ ও দুর্যোগ। সে সময় সরলমনা মুসলিমদের আবেগ-অনুভূতি নিয়ে চতুর মুনাফিকরা মেতে ওঠে হাস্যরসে,পাকাতে থাকে গভীর ষড়যন্ত্র। তাদের এসব ঘটনা ধীরে ধীরে সামনে আসতে থাকে। মুসলিমরাও নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে জড়িয়ে পরে। অথচ তারা সেই প্রজন্ম, যারা ছিলেন নবিগণের পরে সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বোত্তম।

খিলাফতের গুরুদায়িত্ব যখন মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে আসে,তখন খুলাফায়ে রাশিদার সময় ও শাসনে যে আদর্শিক চিত্র বিদ্যমান ছিলো,এখানে তার অনেকটাই অনুপস্থিত। এমন পরিস্থিতিতে মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে পরামর্শ দেওয়া হলো,'এখন যেহেতু ফিতনার সময়,তাই আপনি আপনার পরবর্তী খলিফার জন্য এমন কোনো শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে যান,যাতে মুসলিমদের মধ্যে আর কোনো দ্বন্দ্ব-লড়াই না হয়,ইসলামি খিলাফতও যেন বিভক্ত হওয়া থেকে নিরাপদ থাকে।'

তখন যে পরিস্থিতি ছিল, প্রয়োজনীয়তার বিচারে এ পরামর্শ ও প্রস্তাব মোটেও অগ্রহণযোগ্য বা শরিয়া-বহির্ভূত ছিল না।কিন্তু যখন মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরবর্তী খলিফা হিসেবে তার পুত্র ইয়াযিদের নাম প্রস্তাব করা হয়,তখনই এটা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এ মর্মে মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে কুফা থেকে ৪০ জনের একটি প্রতিনিধিদল পাঠানো হয়।যাদের বক্তব্য হলো,রাষ্ট্রপরিচালনার দক্ষতায় ইয়াযিদের চেয়ে যোগ্য আর কেউ নেই।তাই তার নামে খিলাফতের বাইআত নেওয়া হোক।

মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এ প্রস্তাবটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন।কিন্তু তিনি কোনো সুস্থির সিদ্ধান্তে পৌছঁতে পারেন না।তাই এ বিষয়টি নিয়ে বিশেষ কিছু মানুষের সাথে পরামর্শ করেন।সেই পরামর্শে দেখা দেয় মতানৈক্য। কেউ ইয়াযিদের খলিফা হওয়ার পক্ষে মত দেয়,কেউ দেয় বিপক্ষে।

ইয়াযিদের আচরণগত সমস্যাগুলো তখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।তাই শেষমেশ মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরবর্তী খলিফা হিসেবে ইয়াযিদের হাতে বাইআতগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
(রেফারেন্স :কারবালার প্রকৃত ইতিহাস বই থেকে সংগৃহিত)

একটি ভ্রান্তি নিরসন

সাধারণ ইতিহাস বিষয়ক বইগুলোতে বলা হয়ে থাকে,

খলিফা মুআবিয়া তার পুত্র ইয়াজিযদকে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করে খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে অনুসৃত নির্বাচন পদ্ধতিতে যে আমূল পরিবর্তন আনেন তার ফলেই বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বসরার শাসনকর্তা মুগীরার প্ররোচনায় তিনি ইমাম হাসানের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির অবমাননা করে নিজ ও গোত্রীয় স্বার্থে ইয়াযিদকে মনোনীত করেন।এ ব্যাপারে তিনি ইরাকীদের সমর্থন লাভে সমর্থ হন।এমনকি বলা হয়ে থাকে, কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ খলিফা মুআবিয়া তার অযোগ্য পুত্র ইয়াজিযদকে মনোনয়ন করা।

এ কথার কোনো ভিত্তি নেই। যেখানে সরাসরি হযরত মুয়াবিয়া (রা) কে দোষারুপ করা হয়ে থাকে। অথচ এ ধারণা সম্পুর্ন ভুল। মুয়াবিয়া (রা.) এর গুণ, বৈশিষ্ট্য, রাজত্ব ইত্যাদির দিকে মনোনিবেশ করলেই এ ধারণা ভুল বলে প্রমানিত হবে।

হযরত মুআবিয়া (রা.) ছিলেন কুরআনের ওহী লিখকদের মাঝে অন্যতম একজন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে হতে একশত তেষট্টিটি হাদিস বর্ণানা করেছেন। তিনি ছিলেন রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সম্মানিত সাহাবি। নবীজি একদিন মুআবিয়া (রা) জন্য বিশেষ ভাবে দুআা করে বলেন, হে আল্লাহ তাকে সত্যের পথ প্রদর্শক ও সুপথ প্রাপ্ত বানান এবং তার মাধ্যমে অন্য দেরকেও হেদায়েত দান করুন। খলিফা উমর রাদিআল্লাহু আনহুর সময়ে তিনি টানা বিশ বছর সিরিয়ার গভর্নর হওয়ার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন একজন সৎ দায়িত্বশীল এবং উম্মার চিন্তায় চিন্তিত একজন শাসক।

এটা নিশ্চিত যে, শুরুতে মুআবিয়া (রা.)এর মানসিকতায় ইয়াযিদের স্থলাভিষিক্ততার কোনো পরিকল্পনাই ছিলো না। পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে মুআবিয়া রা. এর ইয়াযিদকে স্থলাভিষিক্ত করার ধারণা আসে। সম্ভবত চিন্তাভাবনার এ সময়টা ছিলো ৪৯ হিজরি থেকে ৫২ হিজরি সালের মাঝামাঝি। এ সময় হাসান রা. পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। হাসান রা. এর প্রতি ভালোবাসার দাবীদাররা মুআবিয়া রা. এর নীতির বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলাপরায়ণ ব্যাক্তিদের প্রীতি ঝুকে পরে।কুফায় বিদ্রোহের আশংকা দেখা দেয়। সম্ভবত এ পরিস্থিতির কারণে মুআবিয়া রা. খিলাফতের বিষয়টি মুসলিমদের শুরার উপর সোপর্দ করতে নিশ্চিত হতে পারেননি।

মুআবিয়া রা. এর সিদ্ধান্তে একমত হয়ে যারা ইয়াযিদের মনোনয়নকে মেনে নিলেন, তাদের অবস্থানও শরয়ি সীমার বাইরে ছিলো না। পরবর্তী শাসক মনোনয়নের শর্তাবলির আলোকে বিচার করা হলে দেখা যাবে, ইয়াজিদের প্রঙ্গা,বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া, মুসলিম হওয়া, সুস্থ ও কুরাইশী হওয়া এমন বাস্তবতা, যার দলিলের কোনো প্রয়োজন নেই।তিনি একটি জিহাদী অভিযানের নেতা ও হজ্জের আমিরও হয়েছিলেন। যার দ্বারা তার মধ্যে যুদ্ধ পরিচালনা ও প্রশাসনে কোনো না কোনো স্তরের যোগ্যতা প্রমাণিত হয়। সুতরাং তার বাহ্যিক অবস্থা দেখে এটা মেনে নেওয়ার অবকাশ ও বিদ্যমান ছিল যে,তিনি খিলাফতের যোগ্য।

এখন থাকল ইয়াজিদের মদপান ও অন্যান্য খারাপ কর্মকান্ডে জড়িত হওয়ার বিষয়টি। তো যে সব বর্ণনা এটা প্রকাশ করে যে, তিনি আমিরে মুআবিয়া রা.এর জীবদ্দশায় এসব কর্মকান্ডে অভ্যস্ত ছিলেন, তা জয়িফ (দুর্বল) ও যুক্তির বিচারে সন্দেহযুক্ত।

বাহ্যত ইয়াযিদকে দুর্বলতাগুলো নিঃসন্দেহে আমিরে মুআবিয়া রা.এর কাছে গোপন ছিল না, কিন্তু তিনি হয়তোবা আশা করেছিলেন,দায়িত্বের বোঝা অর্পনের পর এই ত্রুটিগুলো দূর হয়ে যাবে।তিনি হয়তোবা এটাও আশা করেছিলেন যে, ইয়াযিদ প্রতিটি পদক্ষেপ রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে যুক্ত শীর্ষে যোগ্যতাসম্পন্ন আমির ও উপদেষ্টাদের পথপ্রদর্শন পেতে থাকবে। যার কারণে তিনি ভুল পদক্ষেপ থেকে বেঁচে থাকবেন।

এর পাশাপাশি আমিরে মুআবিয়া রা. ইয়াযিদকে তার অভিজ্ঞতার আলোকে এমন এমন উপদেশ ও পথনির্দেশ প্রদান করেছেন, যাকে সামনে রেখে তিনি একজন সফল শাসক হতে পারতেন। মুআবিয়া রা.এ ব্যাপারে ইসতেখারা ও দুআর পথও অবলম্বন করেছিলেন। তিনি জুমআর দিন মিম্বরে এই দুআ করেছিলেন, ‘হে আল্লাহ, যদি তুমি জানো যে,আমি ইয়াযিদকে তার যোগ্যতার কারণে পরবর্তী খলিফারূপে মনোনয়ন দিয়েছে, তাহলে এই পদকে পরিপূর্ণতা দান করো, যা আমি তাকে দিয়েছে। আর যদি আমি তাকে আমার ভালোবাসার কারণে পরবর্তী খলিফারূপে মনোনয়ন দিয়ে থাকি, তাহলে তার

জন্য এই পদকে পূর্ণতা দান করো না, যা আমি তাকে দিয়েছি’।এর দ্বারা অনুমান করা যেতে পারে যে,মুয়াবিয়া রা.পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে উম্মতের কল্যাণকামিতার ইয়াযিদকে পরবর্তী খলিফারুপে মনোনয়নের সিদ্ধান্ত, নিয়েছিলেন। আর তিনি ইয়াযিদের দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত থাকাসত্ত্বেও নিশ্চিত ছিলেন যে, ইয়াযিদ সঠিকভাবে সরকার পরিচালনা করবেন। যার কারণে মুআবিয়া রা.জরুরি ব্যাবস্থাপনার আয়োজন করে তাকে দুআ, মূল্যবান উপদেশ ও যোগ্য সহচারবৃন্দের পাথেয় দিয়ে যাচ্ছিলেন। সর্বোপরি তিনি গায়েবের জ্ঞানী ছিলেন না যে, ভবিষ্যতের মার্মান্তিক পরিস্থিতি অবলোকন করবেন এবং স্বীয় সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবেন।

তাই উপরিউক্ত বিষয়গুলো পর্যালোচনা করলে কোনোভাবেই এ কথা বলা যায় না যে, খলিফা মুআবিয়া নিজ ও গোত্রীয় স্বার্থে তার পুত্র ইয়াযিদকে মনোনয়ন করেছেন।

ইয়াযিদের নামে বাইয়াত

শাম ও ইরাকের লোকজনের মাঝে কীভাবে যেনো ইয়াযিদের নামে বাইয়াতের আওয়াজ উঠে। সবখানে এ কথা ছড়িয়ে পরে -শাম, ইরাক, কুফা ও বসরার অধিবাসিরা ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত গ্রহনে একমত।

সেসময় হিজাযবাসীর দৃষ্টি ছিল আহলে বাইত তথা নবী পরিবারের দিকে। বিশেষ করে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর দিকে। মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরে তারা তাকেই খিলাফতের সবচেয়ে যোগ্য ও হকদার মনে করত।

এজন্য তারা যখন এ ঘোষণা শোনে যে, ইয়াযিদকে খলিফা হিসেবে মনোনয়ন করা হয়েছে তখন তাদের দৃষ্টি চলে যায় হুসাইন ইবনু আলি, আবদুল্লাহ ইবনু উমার, আব্দুর রহমান ইবনু আবি বকর, আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ও আবদুল্লাহ আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমের দিকে। সেসময় যোগ্যতার বিচারে তারাই ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তাই হিজাযবাসী এ বিষয়ে তাদের মতামত শুনতে চায়।

তাদের চোখে ইয়াযিদের অবস্থান সেসব সাহাবির ধারেকাছেও ছিল না। তাই তারা সমগ্র মুসলিম জাহানের খলিফা হিসেবে ইয়াযিদকে মেনে নিতে পারেনি। এ কারণে তারা ইয়াযিদের খলিফা হওয়ার বিরোধিতা করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমৃত্যু নিজেদের মতের ওপর অবিচল থাকে। এই সত্য উচ্চারণ এবং সত্যের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়াকে কেন্দ্র করেই সংঘটিত হয় মক্কা মদিনার গোলযোগ এবং কুফা কারবালার গণহত্যা।

খলিফা মুআবিয়ার মক্কা ও মদিনা সফর

তখন ৫১ হিজরি। মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু হিজায সফর সফর করেন। প্রথমেই তিনি মদিনা মুনওয়ারায় আসেন। সাক্ষাৎ করেন প্রবীণ ও মর্যাদাবান সাহাবিদের সাথে। তাদের সাথে এক শান্তিপূর্ণ বৈঠকে বসেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সাথে আলোচনা করেন। সেখানে ইয়াযিদের বাইয়াত প্রসঙ্গটি উঠে আসে। তখন সাহাবিগণ সরাসরি তার মতের বিরোধিতা করেন।

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তখনো জীবিত। মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তার নিকট উপদেশ নিতে যান। সাহাবিগন যে বিষয়ে তার বিরোধিতা করেন, সেটি উল্লেখ করে বলেন, 'আম্মাজান, আমি একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চাইছি। কিন্তু সাহাবিরা আমার মতের বিরোধিতা করছেন! '

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তখন বলতে শুরু করেন, 'আমি শুনেছি, আপনি তাদের উপর জুলুম করেছেন। এমনকি তাদের জীবনের হুমকিও দিয়েছেন। আপনার এমনটা করা মোটেই উচিত হয়নি।'

মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আম্মাজান, এটা পুরোপুরি মিথ্যা কথা। আল্লাহর রাসূলের সাহাবিদের সম্মান করা আমার উপর ওয়াজিব। তাদের সাথে আমি মোটেই এমন আচরণ করতে পারি না। বাস্তবতা হলো,শাম, ইরাক- সহ বড় বড় শহরের সাধারণ মুসলিমরা ইয়াজিদের নামে বাইয়াত নিয়েছে। এদিকে খিলাফতের বাইয়াতও সম্পূর্ণ। কিন্তু এ কয়েকজন সম্মানিত ব্যাক্তি শুধু বিরোধিতা করছেন। এখন আপনিই বলুন, মুসলিমরা একজনের খলিফা হওয়ার ব্যাপারে একমত;এদিকে তার বাইয়াতও সম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন আমি কি এ বাইয়াত ভেঙে দিতে পারি?'

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন,'তাদের সাথে কোনো ধরনের কঠোরতা করবেন না। সম্মানের সাথে তাদেরকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলুন।'

মুআাবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন বলেন,'আম্মাজান, আমি এমনটাই করব। এটা আমার ওয়াদা।'

এ সময়ে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু ও আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু ভাবেন, তারা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সে বিষয়ে হয়তো তাদের মত পরিবর্তন করতে বাধ্য করা হবে। সেজন্য তারা পরিবার নিয়ে মক্কায় চলে যান। ওদিকে আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু ও আব্দুর রহমান ইবনু আবি বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুও হজের নিয়তে মক্কায় যান।

মদিনার পর মুআবিয়া হজের নিয়তে মক্কায় যান। সেখানে গিয়ে তিনি, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে পাঠান। তিনি এলে তাকে বলেন, ‘ইবনু উমার,আপনি আমাকে বলতেন, আমিরবিহীন একটি রাতও আপনার পছন্দ নয়। আর আমি সেই আমির নির্ধারণের জন্যই ইয়াযিদের কাছ থেকে এ শর্তে খলিফা হওয়ার বাইআত নিয়েছি - যাতে আমার মৃত্যুর পর মুসলমানদের ভেতরে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির চর্চা ছড়িয়ে না পরে। সবাই এ মতের পক্ষে তাদের অবস্থান জানিয়ে দিয়েছে কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য, আপনি এখনোও এর বিরোধিতা করছেন!তাই আমি আপনাকে সতর্ক করছি, মুসলিমদের সার্বভৌম ঐক্যমতের ভেতর ফাটল ধরাবেন না। এমন কিছু করবেন না যাতে বিশৃঙ্খলা আরোও ছড়িয়ে পড়ে।

আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু সব শুনে বলেন,’আমিরুল মুমিনিন,আপনার আগে আরও খলিফা ছিলেন। তাদেরও সন্তানাদি ছিল,এখনো আছে। আপনার ছেলে কিন্তু তাদের চেয়ে কোনোভাবেই এগিয়ে নেই। তারপরও তারা আপন ছেলেদের জন্য এমন কোনো সিদ্ধান্ত দিয়ে যাননি, যা এখন আপনি দিয়ে বসে আছেন। আপনি আমাকে উম্মাহর বিশৃঙ্খলার ভয় দেখাচ্ছেন? মনে রাখবেন, আমি কখনোই উম্মাহর ভেতর ফাটল ধরাবো না। আমি সাধারণ মুসলিমদের একজন। তারা সবাই একমত হয়ে যেদিকে যাবে,আমার মতও সেদিকেই থাকবে।’(আল কামিল ফিত তারিখ,ইবনুল আসির, খন্ড:৩,পৃষ্ঠা :১০২)

মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন এ বিষয়টি নিয়ে আব্দুর রহমান ইবনু আবি বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনিও কঠোরভাবে ইয়াযিদকে খলিফা হওয়ার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে বলেন,আমি কখনোই তাকে খলিফা হিসেবে মেনে নিব না।
সাহাবিদের এমন কথাবার্তা শুনে মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু হতাশ হয়ে পড়েন। তখন হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ গিয়ে তার সাথে দেখা করেন। তারা তাকে অত্যান্ত বিনয়ের সাথে বলেন -

‘আমিরুল মুমিনিন, আপনার জন্য এটা মোটেই উচিত নয়, আপনি আপনাট ছেলে ইয়াযিদের জন্য আমাদেরকে এভাবে বাইআতগ্রহণে বাধ্য করবেন! আমরা আপনার সামনে তিনটি পদ্ধতি পেশ করছি,এগুলো আপনার পরবর্তী খলিফাদেরও সুন্নাহ -

১.এমন পরিস্থিতিকে সামনে রেখে আল্লাহর রাসূল যা করেছেন আপনিও তাই করুন। তিনি নিজের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে কাউকে সরাসরি নির্বাচন করে যাননি, আভাস রেখে গেছেন। নির্বাচনের দায়িত্ব ছিলো সম্পূর্ণ উম্মাহর কাধে।

২.এ পরিস্থিতিতে আবু বকর যা করেছেন, আপনিও তা করতে পারেন। তিনি এমন একজনের নাম ঘোষণা করেছেন - যিনি না তার বংশীয় কেউ, আর না তার কোনো আত্মীয়। প্রস্তাবিত লোকটির ব্যাপারে কারও আপত্তি ছিলো না।

৩.অথবা উমার ইবনু খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু যা করেছেন, আপনিও তা করতে পারেন। তিনি খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব দিয়ে গেছেন ৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি দলকে।

কিন্তু মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে সেই সিদ্ধান্তের কথাই বলেন,এখন ইয়াযিদের হাতে বাইআত সম্পন্ন হয়ে গেছে। ফলে এখন আর আপনাদের বিরোধিতা করা বৈধ নয়। (আল-কামিল ফিত তারিখ,খন্ড:৩,পৃষ্ঠা :১০৩)
(সোর্স:কারবালার প্রকৃত ইতিহাস বই থেকে)

বাইয়াত হবে না হিজাযবাসী

মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু যতোদিন জীবিত ছিলেন,ঘটনা এতোটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো,শাম ও ইরাকের সাধারণ মানুষ ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত গ্রহন করেছে।মুসলিম জাহানের খলিফা হিসেবে তারা তাকে মেনে নিয়েছে।

অন্য মুসলিমরা দেখতে পায়,ইয়াযিদের পক্ষে মুসলিমদের বেশ বড় একটা দল একত্র হয়ে গেছে, তখন তারাও মুসলিমদের মাঝে বিভেদ ও বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটাতে ইয়াযিদের বাইআত কবুল করে নেয়।
কিন্তু হিজাযবাসী, বিশেষকরে মদিনার অধিবাসীরা তখনো ইয়াযিদের বাইআত মেনে নেয়নি। হুসাইন ইবনু আলি,আব্দুল্লাহ ইবনু উমার ও আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুম তাদের সিদ্ধান্তের ওপর অটল থাকেন।

তাদের কেউই খলিফা হিসেবে ইয়াযিদকে মেনে নেননি। এমনকি কাউকে তোয়াক্কা না করেই সত্যটা বলে যান। ঘোষণা দেন, ‘ইয়াযিদ কখনোই মুসলিম জাহানের খলিফা হতে পারে না। এ যোগ্যতা তার নেই।’
এর মধ্যে মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুবরণ করে ও ইয়াযিদ নিজেকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করে।
(কারবালার প্রকৃত ইতিহাস বই থেকে সংগৃহিত)

খলিফা মুআবিয়ার চির বিদায়

৬০ হিজরি, রজব মাস। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওহি লেখক উমাইয়া খিলাফতের প্রথম শাসক মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেন।(তারিখুলখুলাফা,সুয়ুতি,পৃষ্ঠা :১৫১)মৃত্যুর পূর্বে তিনি তার পুত্র ইয়াজিদকে কিছু উপদেশ দিয়ে যান, যেগুলো ছিল তার পক্ষ থেকে অসিয়ত-স্বরূপ।

মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তার পুত্র ইয়াযিদকে বলেন, ‘শোনো পুত্র আমার ধারণা হচ্ছে, ইরাকবাসী হুসাইনকে তোমার বিরুদ্ধে এনে দাঁড় করাবে।যদি এমন হয় আর তুমি বিজয়ী হও, তাহলে তার সাথে কোনো অন্যায় আচরণ করবে না। তাকে নিঃশর্তে ক্ষমা করে দিবে।হুসাইন আল্লাহর রাসূলের বংশধর। এ কারণে যে সম্মান তার প্রাপ্য, তুমি তাকে সেটা দিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করবে না। এমনিতেও মুসলিমদের ওপর তার রয়েছে বিপুল অধিকার!’(আল-কামিল ফিত তারিখ, খন্ড:৩,পৃষ্ঠা ৩)

(কারবালার প্রকৃত ইতিহাস বই থেকে সংগৃহিত)

ইয়াযিদের শাসনামল

আমীরে মুয়াবিয়া রাঃ এর ইন্তেকালের সময় ইয়াযিদ ছিল হিমসের হাওয়ারীন দূর্গে। সেখান থেকে মৃত্যুর সংবাদ শুনে দ্রুত রাজধানী দামেশকে চলে আসে। ইয়াযিদ আসার আগেই হযরত মুয়াবিয়া রাঃ এর দাফন সম্পন্ন হয়ে যায়। [সিয়ারু আলামিন নুবালা-৩/১৬২]

ইয়াযিদের প্রথম খুৎবা

ইয়াযিদ রাষ্ট্রের সভাসদ এবং দামেশকবাসীর উদ্দেশ্যে শোকবার্তা বক্তব্যে হামদ ও সানার পর বলেন, "মুয়াবিয়া রাঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে একজন বান্দা ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন। তারপর নিজের কাছে নিয়ে গিছেন। তিনি পূর্ববর্তীদের থেকে মর্যাদার দিক থেকে কম হলেও পরবর্তীদের থেকে উত্তম ছিলেন। আমি তাকে আল্লাহর কাছে তাঁর পক্ষে সাফাই গাইছি না। কেননা, আল্লাহ তাআলাই তার ব্যাপারে ভালো জানেন। যদি তার ক্ষমা হয়, তাহলে এটা আল্লাহর রহমত। আর যদি পাকড়াও হন, তাহলে তা নিজের পদস্খলনের কারণে। তারপর যিম্মাদারী আমাকে দেয়া হয়েছে। কোন কিছুর অন্বেষণে আমি ব্যথিত নই এবং কোন কিছুর বর্জনে আমি কৈফিয়ত দানকারী নই। কিন্তু যা আল্লাহ তাআলা মঞ্জুর করেন, তা'ই হয়। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৪৩, ইফাবা-৮/২৭২]

ইয়াযিদের এ খুতবা প্রমাণ করে, সে খলীফা হবার সময় প্রকাশ্য ফাসিক ছিল না। যা আমভাবে মনে করা হয়ে থাকে। বক্তৃতায়ও সে ছিল বেশ পারদর্শী।

বাইয়াতের জন্য বার্তাবাহক প্রেরণ

আমীরে মুয়াবিয়া রাঃ এর শেষ জমানায় কুফায় নু'মান বিন বশীর রাঃ, বসরায় উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ এবং মদীনায় ওলীদ বিন উতবা গভর্ণর ছিল।

ইয়াযিদ খলীফা হবার পর তাদের স্বপদে বহাল রাখেন। নিঃসন্দেহে এটা তার বুদ্ধিমত্তা এবং দূরদর্শিতার পরিচায়ক। (আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৪৬, ইফাবা-৮/২৭৭]

দায়িত্বগ্রহণের পর ইয়াযিদ পুরো মুসলিম মিল্লাতের মাঝে হযরত মুয়াবিয়া রাঃ এর ইন্তেকাল এবং নিজের খিলাফতের বাইয়াত গ্রহণের আহবান করে বার্তাবাহক প্রেরণ করেন। [তারীখে তাবারী-৫/৩৪৭)

হযরত হুসাইন রাঃ ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত হননি কেন?

হযরত মুয়াবিয়া রাঃ এর জীবদ্দশায়ই হযরত হুসাইন রাঃ এবং তার সাথে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর অবস্থান এই ছিল যে, পৈত্রিক রাজত্ব পদ্ধতি পরিহার করে খোলাফায়ে রাশেদীনের জমানার শুরায়ী নিজামে খলীফা নির্ধারণ পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। আর এ দায়িত্ব উন্মতের গুরুত্বপূর্ণ ও সেরা ব্যক্তিদের অধীনত হওয়া উচিত।

এ কারণেই তারা উভয়ে ইয়াযিদকে 'পরবর্তী খলীফা নির্ধারণ' বাইয়াত থেকে বিরত ছিলেন। তাদের উভয়ের ইয়াযিদের কাছে বাইয়াত হয়ে যাওয়ার বিষয়টি 'রুখসত' তথা ছাড় দেয়া হিসেবে করার সুযোগ ছিল। কিন্তু 'আযীমত' বা দৃঢ়তা এটাই ছিল যে, পৈত্রিকসূত্রে খলীফা হবার এ পদ্ধতিকে বাতিল করার চেষ্টা করা, যাতে করে এ প্রচলনের হাত ধরে পরবর্তীতে বড় কোন ফিতনা তৈরী না হয়।

তারা উভয়ে আযীমতের উপর আমল করে প্রাথমিক পদ্ধতি হিসেবে ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। যাতে করে অন্যরাও ইসলামী রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচনের পূর্বের পদ্ধতির যথার্থতা অনুধাবনে সচেতন থাকেন।

হযরত হুসাইন রাঃ কি বিদ্রোহ করতে চেয়েছিলেন? প্রাথমিকভাবে হযরত হুসাইন রাঃ এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর মানসিকতা এতোটুকুই ছিল যে, তারা ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত হবেন না। ব্যস, এতটুকুই। এমন কোন বিশুদ্ধ বর্ণনা পাওয়া যায় না, যার মাধ্যমে একথা বুঝা যায় যে, তারা ইয়াযিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিয়েছেন।

অথচ হযরত হুসাইন রাঃ এর কাছে মুয়াবিয়া রাঃ এর জীবদ্দশা থেকেই কুফার পত্র আসছিল। যেন তিনি সেখানে চলে যান এবং উম্মতে মুসলিমার নেতৃত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন। [আলমু'জামুল কাবীর, তাবারানীকৃত-৩/৭০]

কিন্তু এমন কোন বিশুদ্ধ বর্ণনা নেই, যাতে প্রমাণ হয় যে, হযরত হুসাইন রাঃ সেসব পত্রের জবাব দিয়েছেন বা তাদের আহবানের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন। বরং প্রাথমিক ঘটনাপ্রবাহ পরিস্কার জানায় যে, ইয়াযিদ খলীফা হবার পরও হযরত হুসাইন রাঃ কুফায় যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। মদীনায়ই পুরো জীবন কাটিয়ে দিতে চেয়েছেন। সেই সাথে নিজের ফাতওয়া অনুপাতে বাইয়াত থেকেও বিরত থাকতে মনস্থির করেছিলেন। কিন্তু যখন ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত হতে তাকে চাপ সৃষ্টি করা হল। তখন তিনি বাধ্য হয়ে মদীনা ছাড়লেন। কুফায় যাবার বিষয় নিয়েও ভাবতে শুরু করলেন। [আনছাবুল আশরাফ-৩/১৫৫-১৫৬/

ইয়াযিদের রাজনৈতিক প্রথম ভুল পদক্ষেপ

ইয়াযিদের জন্য উচিত ছিল যে, যারা বাইয়াত হতে চাননি, সেসব নেতৃস্থানীয় বড় ব্যক্তিদের বিষয়ে নাক না গলানো। হযরত আলী রাঃ ও তার খিলাফতের জমানায় বাইয়াত হতে না চাওয়া নেতৃস্থানীয় কারো উপর চাপ সৃষ্টি করেননি। বাইয়াত না হবার কারণে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেননি। সম্মান প্রদর্শনে কোন কমতি করেননি।

ঠিক তেমনি হযরত মুয়াবিয়া রাঃ তার জমানায় যারা ইয়াযিদকে পরবর্তী খলীফা হিসেবে বাইয়াত হতে অস্বিকৃতি জানিয়েছেন, তাদের প্রতি বিরূপ ছিলেন না। তাদের সাথে কঠোরতা করেননি। বাইয়াত হতে বাধ্য করেননি। কিন্তু ইয়াযিদ তার খিলাফাতের জমানায় প্রথম যে মারাত্মক ভুলটি করে, তাহলো সে মুরব্বী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে দ্রুত বাইয়াত গ্রহণে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে।
[আলবিদায়াওয়াননিহায়া-৮/১৪৬-১৪৭, ইফাবা-৮/২৭৭-২৭৮)

এর মাধ্যমে তার মরহুম পিতার সেই অমূল্য নসিহতকে অগ্রাহ্য করে, যাতে ছিল যে, 'নেতৃস্থানীয় মুরব্বীদের সাথে কঠোরতা করবে না। এবং তাদের উপর নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে জোরাজুরি করবে না'। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/২৫১-২৫২]

এই মূল্যবান ওসিয়ত ভুলে গিয়ে ইয়াযিদ মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যার ফলে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে খারাপের দিকে মোড় নেয়। বিশুদ্ধ বর্ণনা মোতাবিক ইয়াযিদ সিংহাসনে আরোহণের পর হযরত মুয়াবিয়া রাঃ এর আযাদকৃত গোলাম রুযাইককে মদীনার গভর্ণর ওলীদ বিন উতবার নিকট প্রেরণ করে। এই মর্মে হুকুম দেয় যে, ওলীদ যেন হযরত হুসাইন রাঃ, হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ কে তরিৎ তার নিজের কাছে ডেকে আনে এবং তাদের থেকে বাইয়াত নেয়।

এই বার্তাবাহকই হযরতে মুয়াবিয়া রাঃ এর ইন্তেকালের সংবাদও নিয়ে যায়।

পত্রবাহক যখন মদীনায় পৌঁছে, তখন রাত হয়ে গিয়েছিল। সে অনেক চেষ্টা মেহনত করে গভর্ণর ওলীদ বিন উতবার সাথে সাক্ষাৎ করে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি পৌঁছায়। (তারীখে খলীফা বিন খাইয়্যাত-

২৩২, আলইকদুল ফরীদ-৫/১২৫]

আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের এবং হুসাইন রাঃ এর মদীনা থেকে মক্কা রওনা

ওলীদ বিন উতবা সংবাদ পাবার সাথে সাথেই প্রথমে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এবং তারপর হযরত হুসাইন রাঃ কে গভর্ণর ভবনে তলব করে। বাইয়াত হবার জন্য অনুরোধ করে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ জবাবে বলেন,

"বাইয়াত হবার এটা কোন সময় নয়। তাছাড়া আমার মত ব্যক্তি একাকী লুকিয়ে বাইয়াত হবো না।

আপনি কালকে মিম্বরে বসে আমার বাইয়াত গ্রহণ করুন"।

এরই মাঝে হযরত হুসাইন রাঃ উপস্থিত হলেন। ওলীদ বিন উতবা নরম স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তিনি যখন হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর যুক্তিকে সঠিক মনে করে কালকে বাইয়াত হবার সিদ্ধান্ত নিলেন। তখন হযরত হুসাইন রাঃ কে বাইয়াত হবার জন্য কোন চাপ সৃষ্টি করলেন না। উভয়কে বাইয়াত ছাড়াই যাবার অনুমতি দিয়ে দিলেন। তবে খবর রাখার জন্য সাথে কিছু লোককে পাঠালেন।

তারা উভয়ে বুঝে গেলেন যে, বাইয়াত না হলে তাদের উপর রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কঠোরতা করা হবে। তা'ই রাতের শেষ প্রহরে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ অপ্রসিদ্ধ একটি রাস্তা দিয়ে মদীনা থেকে বের হয়ে মক্কা রওনা হয়ে গেলেন। তারীখে খলীফা বিন খাইয়্যাত-২৩২]

ওলীদ যখন সকালে তার অনুপস্থিতির কথা জানতে পারলো, তখন তার খোঁজে ৩০ বা ৮০ জন ঘোরসওয়ার প্রেরণ করল। কিন্তু তারা আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর টিকিটাও খুঁজে পেল না। [আনছাবুল আশরাফ-৫/৩০০, বালাজুরীকৃত, তারীখে তাবারী-৫/৩৪১]

এক দুইদিন পর হযরত হুসাইন রাঃ তার পরিবারসহ মদীনা থেকে মক্কা রওনা হবার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। [তারীখে তাবারী-৫/৩৪১]

মদীনা থেকে মক্কাকে নিরাপদ আশ্রয় মনে করার কারণ এই ছিল যে, একেতো মক্কা পবিত্র শহর। রাষ্ট্রপক্ষীয় দায়িত্বশীলরা ক্ষমতা প্রয়োগ করে উক্ত পবিত্র ভূমির পবিত্রতা বিনষ্ট করার সাহস করবে না। দামেশক থেকে মদীনা কাছে। কিন্তু মক্কা বেশ দূরে। তাছাড়া মদীনার তুলনায় মক্কা ছিল পাহাড়ে ঘেরা শহর। যাতে সহজেই রাষ্ট্রীয় সেনাদের থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখা

সহজতর ছিল। এসকল কাররওনা হবার সময় আব্দুল্লাহ বিন উমরণে হযরত হুসাইন রাঃ এবং আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ মদীনা ছেড়ে মক্কায় নিজেদের অধিক নিরাপদ মনে করলেন।

হুসাইন রাঃ এর মদীনা রাঃ এর সাথে সাক্ষাৎ

হুসাইন রাঃ মক্কা রওনা হবার পূর্বে আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ এর সাথে সাক্ষাৎকরেন। ইবনে উমর রাঃ পরামর্শ দিলেন যেন তিনি কোথাও না যান। কিন্তু হুসাইন রাঃ কুফা থেকে পাওয়া পত্রগুলো দেখালেন।

পত্রগুলো দেখে হযরত ইবনে উমর রাঃ মন্তব্য করলেন, "হুসাইন। আপনি তাদের কাছে যাবেন না"। কিন্তু হুসাইন রাঃ কুফাবাসীকে বিশ্বাস করে ইবনে উমরের কথা মানলেন না। ইবনে উমর রাঃ বিদায় মুহুর্তে হযরতে হুসাইন রাঃ এর গলা জড়িয়ে ধরে অনেক কাঁদলেন। কেঁদে কেঁদে বললেন, “হে শহীদ। তোমাকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করলাম”। [মাযমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস নং- ১৫১৩০, আলমু'জামুল আওসাত, হাদীস নং-৫৯৭, তারীখে দামেশক-৪/২০২]

হযরত হুসাইন রাঃ মদীনা থেকে মক্কা রওনা হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুতী' রাঃ এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় যাচ্ছেন"? তখন হযরত হুসাইন রাঃ জবাবে বললেন যে, আপাতত মক্কা যাচ্ছি, তারপর ভবিষ্যতে কী করবো? সেখানে গিয়ে এ বিষয়ে ইস্তিখারা করবো। [আনছাবুল আশরাফ-৩/১৫৫-১৫৬)

এর মাধ্যমে বুঝা যায় যে, হযরত হুসাইন রাঃ মক্কায় যাবার সময়ও কুফায় যাবার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। যদি তা'ই করতেন, তাহলে মক্কায় গিয়ে ইস্তিখারা করে সিদ্ধান্ত নেবার কথা বলতেন না।

তাছাড়া মদীনা থেকে কুফা তুলনামূলক কাছে। যদি কুফায় যাবারই দৃঢ় সিদ্ধান্ত থাকতো, তাহলে তিনি মক্কায় না গিয়ে খুব সহজে মদীনা থেকেই কুফায় চলে যেতে পারতেন।

প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুপাতে ২৭ বা ২৮ রজব রবিবার দিন হযরত হুসাইন রাঃ মদীনা থেকে রওনা হন। তারপর দ্রুত সফর করে ৩ বা ৪ শাবান মক্কায় আগমন করেন। মক্কায় তিনি ৬০ হিজরীর ৮ই জিলহজ্জ পর্যন্ত তথা ৪ মাস ৫ দিন অবস্থান করেন। এই সময়ের মাঝে সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে ছিলেন। [তারীখে তাবারী-৫/৩৮১, আনছাবুল আশরাফ-৩/১৬০]

হুসাইন রাঃ এর আন্দোলনের আসল রহস্য

হযরত হুসাইন রাঃ ঐ ব্যক্তিত্ব যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তত্ত্বাবধানে উচ্চতর ঈমানী শক্তি এবং চারিত্রিক উৎকর্ষতা অর্জন করেছেন। হযরত আবু বকর রাঃ, হযরত উমর রাঃ এবং হযরত উসমান রাঃ এর স্নেহ মোহাব্বতই শুধু পাননি, বরং তাদের সংশ্রবে আত্মিক শক্তি অর্জন করেছিলেন। পুরো উম্মতে মুসলিমার মাঝে সবচে' উঁচু বংশ নবীর বংশীয় ছিলেন। আলী রাঃ এর মত হায়দারে কাররারের ইলম, ফাকাহাত, জ্ঞান, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ইত্যাদিরও জানেশীন ছিলেন।

দ্বীনী বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্ব, ইলমী গভীরতা, দ্বীনদারী, আমানতদারী, খুলুসিয়্যাত, লিল্লাহিয়্যাত, নির্ভীকতা, এককথায় তৎকালিন সময়ে তিনি অদ্বিতীয় যোগ্য ও মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অনভিজ্ঞ, রক্ত গরম আবেগী কোন যুবক ছিলেন না হযরতে হুসাইন রাঃ। ছষ্ঠ দশক পেরিয়ে ৭ম দশকে পৌঁছার নিকটবর্তী ছিল বয়স।

এমন ব্যক্তিত্ববান মানুষের ক্ষেত্রে এমন ধারণা করা মোটেও যুক্তিসঙ্গত নয় যে, তিনি কেবল ইয়াযিদের ব্যক্তিগত দুর্বলতা এবং তার পাপাচারের প্রোপাগান্ডা শুনে তার হাতে বাইয়াত নিতে অস্বিকৃতি জানিয়েছেন। বরং এর পেছনে নিশ্চয় কোন বড় কারণ ছিল।

সেটা হল, তিনি তার দূরদৃষ্টির মাধ্যমে একথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, যদি এভাবে শাসকের সন্তান শাসক হবার প্রথা চালু হয়ে যায়, তাহলে তা পরবর্তীতে মুসলিম মিল্লাতের জন্য বিরাট ক্ষতির কারণ হতে পারে। অনেক অযোগ্য ও অথর্ব সন্তানও কেবল বাবা শাসক ছিল বলে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে যাবে।
ফলে মুসলিম জাহানের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হবে।

তিনি একথার দাবী একবারও করেননি যে, ইয়াযিদ শাসক হবার যোগ্য নয়। এমনকি ইয়াযিদ ফাসিক, পাপাচারী এমন অভিযোগও হযরতে হুসাইন রাঃ থেকে কোন বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত নয়। বরং তার মূল দাবী ছিল, ইয়াযিদের খলীফা নিযুক্তকরণ পদ্ধতি সঠিক ছিল না। এটা পরবর্তীতে ইসলামী সালতানাতে রাজতন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে উম্মতে মুসলিমাকে বিশাল মুসিবতে নিপতিত করবে।

উম্মতে মুসলিমাকে আগত সেই মুসিবত থেকে রক্ষাকল্পে নিজের জানের বাজী লাগাতে প্রস্তুত হয়ে যান নবীজীর দৌহিদ্র মদে মুমিন হযরতে হুসাইন রাঃ। যদিও তার এ মতামতের সাথে তার নিকটতম ব্যক্তিবর্গের মাঝে অনেকেই বিরোধীতা করেছেন। যেমন ছোট ভাই মুহাম্মদ

বিন আলী রাঃ, বোন জামাতা হযরত উবায়দুল্লাহ বিন যা'ফর রাঃ হুসাইন রাঃ এর অবস্থানের সাথে একমত ছিলেন না।

তাছাড়া মুয়াবিয়া রাঃ এর ইন্তেকালের পূর্বে তিনি যখন ইয়াযিদকে পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের বাইয়াত গ্রহণ করছিলেন, তখন হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ বিরোধীতা করলেও ইয়াযিদ খলীফা হয়ে যাবার পর তারা তাকে খলীফা হিসেবে মেনে নেন। তার বিরোধীতা করাকে পছন্দ করতেন না।

ইয়াযিদের শাসন এবং হুসাইন রাঃ এর বাইয়াত হতে অস্বিকৃত

হযরতে হুসাইন রাঃ কি রাষ্ট্রদ্রোহী ছিলেন?
এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায়। সেটি হল, ইয়াযিদের শাসনব্যবস্থা কায়েম হয়ে যাবার পর হযরত হুসাইন রাঃ এর বিরোধীতা কি রাষ্ট্রদ্রোহ হিসেবে ধর্তব্য হবে?

সত্য কথা হল, হযরত হুসাইন রাঃ এর বিরোধীতার শুরু লগ্ন থেকে শেষ পর্যন্ত যখন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের দিকে ঘটনা মোড় নিতে থাকে, তখনো তার অবস্থান এতোটাই সতর্ক ও ভারসম্যতার সাথে আঞ্জাম দিয়েছেন যে, তার কার্যকলাপের উপর রাষ্ট্রদ্রোহিতার মত ভয়াবহ অভিযোগ তোলার কোন সুযোগ নেই। এ বিষয়ে সমঝদারীর সাথে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, হযরত হুসাইন রাঃ এর মতামত ও ইজতিহাদ অনুপাতে ইয়াযিদের খেলাফত পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। কারণ, মুয়াবিয়া রাঃ এর জীবদ্দশায় নেয়া পরবর্তী খলীফা নির্ধারণ বিষয়ক বাইয়াত শুধুমাত্র একটি পরামর্শ ছিল। এর দ্বারা ইয়াযিদের খেলাফত সাব্যস্ত হয়ে যায় না।

আর তিনি যেহেতু ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেননি, তাই এখানো খলীফা হিসেবে ইয়াযিদ তার কছে স্বীকৃত হয়নি। এছাড়া কুফা থেকে যে চিঠি আসছিল, তা দ্বারা সাফ জানা যাচ্ছিল যে, পুরো ইরাকবাসী হযরতে হুসাইন রাঃ এর জন্য অপেক্ষমান। এখনো ইরাকে ইয়াযিদের বাইয়াতে খেলাফত পূর্ণতা পায়নি। তারা কেউ ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেনি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইয়াযিদ যেহেতু তখনো পূর্ণ খলীফা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেনি, তাই তার বিরোধীতা রাষ্ট্রদ্রোহীতার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

যেমন ইতোপূর্বে হযরত উসমান রাঃ এর হত্যার বিচার হবার আগে হযরত আলী রাঃ এর হাতে বাইয়াত হতে অস্বিকৃতি জানিয়েছিলেন আম্মাজান আয়শা রাঃ এবং মুয়াবিয়া রাঃ, তালহা ও যুবায়ের রাঃ। বাইয়াত না হওয়া এবং শামের লোকদের হযরত আলী রাঃ এর বাইয়াত

হতে না চাওয়ার ফলে আয়শা রাঃ ও মুয়াবিয়া রাঃ এর বিরোধীতাকে রাষ্ট্রদ্রোহীতা হিসেবে ধরা কঠিন।

কারণ, তাদের ইজতিহাদী রায় হিসেবে উসমান রাঃ এর বিচার আগে করা বিষয়ে আলী রাঃ এর বিরোধীতা করাকে তারা রাষ্ট্রদ্রোহীতা মনে করেননি। কারণ, তাদের কাছে তখনো আলী রাঃ এর খিলাফত পূর্ণতা লাভ করেনি। কিন্তু আসল হাকীকত ছিল ভিন্ন। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত আলী রাঃ যথার্থ ছিলেন। আর মুয়াবিয়া রাঃ ও আম্মাজান আয়শা রাঃ এর ইজতিহাদী ভুল হয়েছিল। আর মুজতাহিদ ভুল করলে কোন গোনাহ হয় না। বরং ভুল করলেও তারা সওয়াবের অংশীদার হয়ে থাকেন।

হযরত হুসাইন রাঃ এর বক্তব্য ও অবস্থান অনুপাতে ইয়াযিদের খেলাফত পূর্ণ হয়নি তখনো। কারণ, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান দুই শহর মক্কা ও মদীনার অধিকাংশ লোকেরা ইয়াযিদকে দিল থেকে খলীফা মানতে পারছিল না। আর ইরাকের সংবাদ তিনি চিঠির মাধ্যমে জানতে পারছিলেন। কুফার গভর্ণর হযরত নু'মান বিন বশীর রাঃ ও ইয়াযিদের বিপরীতে হযরত হুসাইন রাঃ কে খলীফা মানতে প্রস্তুত ছিলেন। [আলমিহান-১৫০)

সেই হিসেবে হযরত হুসাইন রাঃ এর কাছে ইয়াযিদ জোরপূর্বক শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি হিসেবেই প্রতিয়মান হয়। এ হিসেবে হযরত হুসাইন রাঃ এর কাছে পরিস্কার হয় যে,

১. ইয়াযিদ মুসলমানদের ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করে জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছে।

২. ইয়াযিদের খেলাফত এখানো পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সুতরাং এখনি যদি তা রুখে দেয়া যায়, এবং পূর্বসূরী খোলাফায়ে রাশেদীনের পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচনের পদ্ধতিকে পুনর্জিবীত করা যায়, তাহলে তা যুৎসই ও যথার্থ হবে। আর এজন্য চেষ্টা ও মেহনত করাটা রাষ্ট্রদ্রোহীতার অন্তর্ভুক্ত হবে না। যে রাষ্ট্রদ্রোহীতাকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

এখন প্রতিবাদ প্রতিরোধ করাটা কোন প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে ভেঙ্গে ফেলতে চেষ্টা করা নয়, বরং একটি বিভক্ত রাষ্ট্রকে একত্রিত করে খোলাফায়ে রাশেদীনের সোনালী পদ্ধতিতে ফিরিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা মাত্র। এছাড়া হযরত হুসাইন রাঃ এর সামনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এর ফরমানও ছিল যে, কোন অপছন্দনীয় কাজ দেখলে তা প্রতিহত করতে করতে হবে

সাধ্যানুপাতে। প্রথমে হাত দিয়ে, না পারলে জবান দিয়ে, সর্বনিম্ন হলো মনের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে।

হযরত হুসাইন রাঃ এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ তাই নিজের সাধ্যের সবটুকু দিয়ে তাদের দৃষ্টিতে এ মাকরূহ কার্যক্রমকে বন্ধ করাকে নিজের উপর জরুরী বলে মনে করতে লাগলেন। এজন্য নিজের প্রাণকে উৎস্বর্গ করতেও দ্বিধাবোধ করবেন না।

মদীনায় ধরপাকড় এবং ওলীদ বিন উতবাকে বরখাস্তকরণ

ওলীদ হযরত হুসাইন রাঃ এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ মক্কা রওনা হয়ে যাবার পর মাসআব বিন আব্দুর রহমান এবং আব্দুল্লাহ বিন মুতী' আলআদয়ী রাঃ কে গ্রেফতার করে জেলে বন্দী

করলেন। যারা আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর সমর্থক ছিলেন (মদীনাবাসী হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ এর কাছে আবেদন করলেন যে, যেন প্রশাসন এভাবে কঠোরতা করা থেকে যেন বিরত থাকে। হযরত ইবনে উমর রাঃ পেরেশান হয়ে ওলীদ বিন উতবার সাথে সাক্ষাৎ করেন। বললেন, 'স্বীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত রাখতে হকের উপর অটল থাকো, জুলুম করো না। যাদের গ্রেফতার করেছো তারা নির্দোষ। তাদের ছেড়ে দাও'।

ওলীদ বিন উতবা ওজরখাহী পেশ করল। আমীরুল মু'মিনীন ইয়াযিদের আদেশ এমনটাই। তাই লঙ্ঘণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। মদীনাবাসী যখন দেখলো যে, আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ এর মত ব্যক্তিত্ব এর সুপারিশ পর্যন্ত ফিরিয়ে দেয়া হল। তখন তারা জেলখানায় হামলা করে বসে। এর ফলে আব্দুল্লাহ বিন মুতী' মুক্ত হয়ে মক্কায় চলে যান। আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর সাথে গিয়ে মিলে যান। [আনছাবুল আশরাফ-৫/৩০২]

হযরত হুসাইন রাঃ এবং ইবনে যুবায়ের রাঃ এর মদীনা থেকে বের হয়ে যাওয়ায় ইয়াযিদের চিন্তা বেড়ে যায়। উক্ত হযরতদ্বয়ের বাইয়াত নিতে অকৃতকার্য হবার সমস্ত দায়ভার ওলীদ বিন উতবার উপর চাপিয়ে তাকে বরখাস্ত করে দেন। তার স্থলে আমর বিন সাঈদ আললআশদাক কে নিয়োগদান করেন। যে কঠোর স্বভাবের অধিকারী বলে প্রসিদ্ধ ছিল। [তারীখে তাবারী-৫/৩৪৩] আমর বিন সাঈদ রমজানে মদীনা আগমন করে। [তারীখে তাবারী-৫/৩৪৩]

এসেই ঘোষণা দেয় যে, সে যেখানে তারা আশ্রয় নিয়েছেন সেই স্থানে হামলা করবে। [তারীখে খলীফা বিন খাইয়্যাত-২২৩] কিন্তু তার জন্য হামলা করার সুযোগ ছিল না। কারণ, শাওয়াল

মাস নিকটবর্তী। হাজীদের কাফেলা মক্কায় আগমনের অপেক্ষমান। এমতাবস্থায় পবিত্র শহরে পবিত্র মাসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের উপর হামলা করা কিছুতেই বরদাশত করবে না। তাই ইচ্ছে থাকা সত্বেও আমর বিন সাঈদ হামলা থেকে বিরত থাকে। হচ্ছে মওসূম শেষ হওয়া এবং হাজীদের ফিরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া ইয়াযিদ প্রশাসনের আর কোন উপায় ছিল না।

হযরত হুসাইন রাঃ ইরাক যাবার সংকল্প কেনো করলেন?

এই উত্থান পতনের পরিস্থিতি নিয়ে হযরত হুসাইন রাঃ এবং আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর মাঝে দফায় দফায় পরামর্শ হয়। অবশেষে তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, একটি স্থানকে কেন্দ্র বানিয়ে নিজেদের মেহনত চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কেন্দ্র কোন স্থানকে বানানো হবে? এ বিষয় নিয়ে উভয়ের মাঝে মতভেদ দেখা দেয়। আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর মত ছিল এই যে, মারকায মক্কাকে বানানো হোক। কারণ, মক্কাই সব'চে নিরাপদ। মক্কা পুরো মুসিলম মিল্লাতের ঈমানী ও রূহানী কেন্দ্রভূমি। মক্কায় যেমন সাহায্যকারী নিজেদের গোত্র কোরাইশরা রয়েছে, তেমনি মুত্তাকী পরহেযগারদের এক বড় জামাতও বিদ্যমান।

তাই তিনি চাইলেন যে, হযরত হুসাইন রাঃ ও যেন মক্কাকেই কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করেন। কিন্তু হযরত হুসাইন রাঃ এর কাছে ইরাক থেকে একের পর এক পত্র এবং প্রতিনিধি দল আসছিল। যারা হযরত হুসাইন রাঃ এক সর্বাত্মক সহযোগিতা করার আশ্বাস দেয়ায় তিনি ইরাক যাবার দিকেই
মনস্থির করছিলেন। ইরাকে যাবার পেছনে হুসাইন রাঃ এর প্রথম কারণ এই ছিল যে, আন্দোলনে সাধারণ মানুষের জানমাল হেফাযত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হেযাজের তুলনায় ইরাকে তার অনুসারীদের সংখ্যা বেশি থাকায় শক্তিও বেশি থাকবে। ফলে কম ক্ষতির সম্মুখিন হয়ে সফলতার মুখ দেখা সহজ হবে বলেই তিনি মনে করলেন।

দ্বিতীয়ত হযরত হুসাইন রাঃ নিজের জানের চেয়ে পবিত্র নগরীর পবিত্রতাকে রক্ষা করাকে বেশি জরুরী মনে করলেন। যে কারণেই হযরত উসমান রাঃ নিজের জানের কুরবানীতো পেশ করেছেন, কিন্তু পবিত্র নগরীতে রক্তপাত করাকে সাপোর্ট করেননি।

এ কারণে হযরত আলী রাঃ ও মক্কা মদীনা ছেড়ে কুফাকে রাজধানী বানিয়েছিলেন। হযরত হুসাইন রাঃ জানতেন যে, এখন হজ্জ চলছে বলে তার উপর হামলা করা বন্ধ আছে। কিন্তু হজ্জ শেষ হতেই তার উপর আক্রমন করা হবে। তাই তিনি পবিত্র নগরীকে রক্তপাত থেকে

রক্ষা করতে মক্কা ছেড়ে দেয়াকেই প্রাধান্য দিলেন। মক্কায় থাকাকালীন আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ কে বললেন, "যদি আমাকে অন্য কোথাও হত্যা করা হয়, তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু আমার কাছে এটা সহনীয় নয় যে, আমার কারণে পবিত্র নগরীর পবিত্রতা বিনষ্ট হোক"। [আখবারে মক্কা, ফাকেহীকৃত-২/২৪২]

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত হুসাইন রাঃ কুফার লোকদের কৃত অঙ্গিকারভঙ্গের সম্ভাবনা এবং ইয়াযিদ প্রশাসনের কঠোরতার ব্যাপারে ওয়াকিফহাল ছিলেন। যেহেতু ইরাকবাসী তার সাথে গাদ্দারী করতে পারে এ সন্দেহ ছিল। এ কারণেই তিনি ইরাক রওনা হবার বিষয়ে তাড়াহুড়া করেননি। বরং খোঁজখবর নিয়ে ধীরে সুস্থ্যে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

নেতৃস্থানীয় এবং মুরুব্বীগণ ইয়াযিদের হাতে কেন বাইয়াত হলেন?

প্রশ্ন হল, যদি ইয়াযিদের খেলাফতলাভ খোলাফায়ে রাশেদীনের তরীকায় না'ই হয়ে থাকে, তার কার্যক্রম প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীগণের বিরাট জামাত তার হাতে কেন বাইয়াত হয়েছিলেন?

বাস্তব কথা হল, তাদের মাঝে একদল হযরত মুয়াবিয়া রাঃ এর দলীল ও ইজতিহাদের সাথে একমত ছিলেন। আর কতক শরীয়তের আরেকটি হুকুম পালনের নিমিত্তে বাইয়াত হন। সেটি হল, "একতা ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখো। পরস্পর বিভক্ত হয়ো না"।

একতার উক্ত হুকুমটি কুরআন ও হাদীসের অনেক স্থানেই উদ্ধৃত হয়েছে। এ গুরুত্বপূর্ণ হুকুমটি পালনের জন্য কিছু কিছু অবস্থায় নিজের অবস্থান থেকে সরে গিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনুত্তম বস্তুকে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই থেকে নেতৃস্থানীয় সাহাবা ও তাবেয়ীগণ ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে উম্মতকে একতাবদ্ধ রাখতে ভূমিকা রাখেন।

হামীদ বিন আব্দুর রহমানের এক বর্ণনায় এসেছে যে, ইয়াযিদ খলীফা হবার সময় তিনি একজন সাহাবীর কাছে গেলেন। তখন উক্ত সাহাবী বলেন, "তোমরা বল যে, ইয়াযিদ উম্মতের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তি নয়, ইলম, ফাকাহাত এবং মর্যাদায় সবার চেয়ে উত্তমও নয়। আমিও একথাই বলি। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি উম্মতে মুহাম্মাদীর একত্রিত থাকাকে তাদের বিভক্ত হয়ে যাওয়ার উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকি। [তারীখে খলীফা বিন খাইয়্যাত-২১৭]

মুরব্বীশ্রেণীর ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত হবার আরেকটি কারণ ছিল এই যে, সেসময় ইয়াযিদ বিষয়ে কোন খারাপ ধারণা কারো ছিল না। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা, হাররার ঘটনা এবং কা'বা অবরোধ ইত্যাদির মাধ্যমে তার চরিত্রে যে কালোদাগ অঙ্কিত হয় তাতো প্রকাশ পায় খলীফা হবার পর। কিন্তু খলীফা হবার আগে ইয়াযিদের চারিত্রিক কোন মারত্মক পদস্খলনও সংঘটিত হয়নি।

সে ছিল পরীক্ষিত সেনানায়ক। হজ্জের প্রধান ইমামের দায়িত্বপালনকারী। একজন সাহাবীর সন্তান। তাবেয়ী। নেক ও মুত্তাকী পরিবারের সন্তান। এইসব গুণাবলীর দিকে তাকিয়ে অনেক সাহাবা ও তাবেয়ীগণ ভালো কিছুই হবে সেই আশায় তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। এছাড়া নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি হাদীস রয়েছে-

عَنْ إِنسِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال " اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা শোন ও আনুগত্য প্রকাশ কর, যদিও তোমাদের উপর এমন কোন হাবশীকে আমীর নিযুক্ত করা হয় যার মাথা কিসমিসের মতো। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৬৯৩, ইফাবা-৬৬০]

এ হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে, যখন কোন খলীফা যেভাবেই হোক যদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাহলে তাকে মেনে নেয়া উচিত। তার বিরোধীতা করা যাবে না। যদিও সে দেখতে কুৎসিত হয় না কেন। উক্ত হাদীসের উপর আমল হিসেবেও অনেক সাহাবা ও তাবেয়ীগণ ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত হওয়াকেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের বাস্তবায়ন মনে করেছেন। তাই তার হাতে বাইয়াত হয়ে গেছেন।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ এবং আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ এর ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত

ইয়াযিদের প্রতিনিধি যখন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ এর কাছে বাইয়াত নেবার জন্য মক্কা আসে, তখন তিনি উপস্থিত সবাইকে বলেন, "আল্লাহর কসম! মুয়াবিয়া তার আগের খলীফাদের মত ছিল না। কিন্তু তারপর তারমতও আর কেউ আসবে না। নিশ্চয় ইয়াযিদ তার নেক পরিবারের সন্তান। সুতরাং আপনারা সবাই স্বীয় স্থানে আরাম করে বসে থাকুন। ইয়াযিদের বাইয়াত করে তার আনুগত্ব করুন। তারপর তিনি নিজেও বাইয়াত হন। [আনছাবুল আশরাফ-
৫/২৯০/
হযরত আব্দুল্লাহ উমর রাঃ এর অবস্থান এই ছিল যে, যদি সবাই বাইয়াত হয়ে যায়, তাহলে তিনিও বাইয়াত হয়ে যাবেন। [আসসুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী, হাদীস নং-১৬৮০৯, আনছাবুল আশরাফ-
৫/৩০১]

তাই তিনি যখন দেখলেন যে, অধিকাংশরাই বাইয়াত হয়ে গেছেন, তখন তিনিও বাইয়াত হয়ে যান। [সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী, হাদীস নং-১৬৬৩২)

বুঝা যায় যে, তার এ বাইয়াত মনের টানে ছিল না। সন্তুষ্টচিত্তে ছিল না। বরং সকলে হয়ে গেছেন দেখে বাধ্য হয়ে তিনিও বাইয়াত হয়েছেন। এ কারণেই তিনি তার বাইয়াত হবার সময় বলেন, "যদি এর মাধ্যমে ভালো হয়, তাহলে আমি রাজি, আর যদি ক্ষতি হয়, তাহলে আমরা ধৈর্যধারণ করবো। [তারীখে খলীফা বিন খাইয়্যাত-২১৭]

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের প্রতি ইয়াযিদের পত্র

হযরত হুসাইন রাঃ মক্কায় অবস্থান করছিলেন। সে সময় আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ এর কাছে ইয়াযিদ একটি পত্র প্রেরণ করে। যার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, সে হুসাইন রাঃ এর কার্যক্রম বিষয়ে নজর রাখছিল। তার থেকে বিদ্রোহের আশংকা করছিল। তাই পত্রের মাধ্যমে এ বিষয়ে কড়া হুশিয়ারী প্রদান করে।

পত্রে ইয়াযিদ লিখে যে,

"হুসাইন রাঃ এর নিকট পূর্ব থেকে লোকজন এসে তাকে খেলাফতের আশা দিচ্ছে। আপনি অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত অভিজ্ঞ মানুষ। যদি হুসাইন রাঃ এমন করেন, তাহলে আত্মীয়তার বন্ধন ছিড়ে যাবে। আপনি বংশের বড় এবং সম্মানিত ব্যক্তি। আপনি তাকে এ বিদ্রোহ থেকে বাঁধা প্রদান করুন।"

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ উত্তরে লিখলেন,

"আমার প্রত্যাশা যে, হুসাইন রাঃ এর গমণ এমন কোন কাজের জন্য হবে না, যা আপনার জন্য অসন্তুষ্টির কারণ হবে। [তারীখে দামেশক-৪/২১০]

মোটকথা, দামেশক প্রশাসনের কাছে হুসাইন রাঃ এর বিষয়টি খুবই গুরুত্ববহ ছিল। হুসাইন রাঃ এর যোগাযোগ কুফার জনগণের সাথে হওয়ায় ইয়াযিদের ভয় হয় যে, তারা সম্মিলিতভাবে বিদ্রোহ করে বসবে। এদিকে হযরত হুসাইন রাঃ ভাবলেন যে, ইয়াযিদ ও তার নির্ধারিত গভর্ণররেরা হুসাইন রাঃ এর অবস্থান সম্পর্কে না বুঝেই বিদ্রোহ মনে করে তাদেরকে হত্যা করতে উদ্যত হতে পারে।

কারণ, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে তাকে হত্যা করার কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

হযরত আরফাজাহ রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ

মুসলিমগণ ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি তাদের কাজে বাধা দিবে সে যে-ই হোক, তোমরা তাকে তরবারি দিয়ে হত্যা করো। [সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৭৬২, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৮৫২]

সে যেই হোক না কেন, যদি সে মুসলমানদের একতার মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করতে আসে, তাহলে তাকে হত্যা করতে বলা হয়েছে।

যদিও হযরত হুসাইন রাঃ এর দৃষ্টিতে ইয়াযিদের খেলাফত পূর্ণতা পায়নি। এখনো তার অধীনে উম্মত একতাবদ্ধ হয়নি বলেই প্রতিয়মান হয়েছিল। তাই ইয়াযিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে তিনি একতা বিনষ্টের কারণ হিসেবে গণ্য করেননি। কিন্তু ইয়াযিদ ও তার প্রশাসনের দৃষ্টিতে তা ছিল রাষ্ট্রদ্রোহিতা। তাই তারা যেকোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে বলে হযরত হুসাইন রাঃ আশংকা করলেন। এ কারণে, সরাসরি ইয়াযিদের সাথে কথা না বলে আগে কুফা গমণ করে নিজেদের শক্তিমত্তা মজবুত করার পর বিষয়টির সূরাহা করতে চেয়েছিলেন।

হযরত হুসাইন রাঃ এর নামে কুফার শিয়াদের পত্র

কুফাবাসী শিয়ারা অসংখ্য চিঠি হযরত হুসাইন রাঃ এর কাছে প্রেরণ করে। শিয়াদের প্রকাশিত শোকার্তের দীর্ঘশ্বাস এর মাঝে আসছেঃ-

"আর কুফার জনগণের বিষয়ে, যখন তারা মুয়াবিয়ার মৃত্যু সংবাদ পেলো তারা ইয়াযিদ সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করতে শুরু করল। এছাড়া তারা জানতে পেরেছিল যে, ইমাম হুসাইন (আ.) ইয়াযীদের প্রতি আনুগত্যের শপথ করতে অস্বিকার করেছেন এবং মক্কায় চলে গিয়েছেন। আর আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরও মক্কায় পালিয়ে গেছে তার সাথে এবং তার সাথে এবং তার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

ইমামের শিয়ারা (অনুসারীরা) সুলাইমান বিন সুরাদ খুযাইর বাড়িতে জড়ো হয় মুয়াবিয়ার মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করতে এবং আল্লাহর প্রশংসা এবং তাসবীহ করতে। সুলাইমান উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'মুয়াবিয়ার মৃত্যু হয়েছে এবং ইমাম হুসাইন (আ.) ইয়াযীদের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে অস্বীকার করেছেন ও মক্কায় চলে গিয়েছেন। তোমরা তার ও তার বাবার শিয়া (অনুসারী)। তাই যদি তোমরা তাকে সাহায্য কতে চাও ও তার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে চাও তাকে চিঠি লিখো এবং তাকে এ বিষয়ে জানাও। কিন্তু যদি তোমরা ভয় পাও যে তোমরা ঢিলেমী করবে এবং পিছু হটবে তাহলে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না (তাকে

এখানে আমন্ত্রণ জানিয়ে)।' প্রত্যেকেই ঐক্যবদ্ধভাবে শপথ করলো যে, তারা তাকে সাহায্য করবে এবং তার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তার আদেশে এবং তাদের জীবনকে এগিয়ে দিবে কুরবান করতে। যখন সুলাইমান তা শুনলেন, তিনি তাদেরকে আহবান জানালেন ইমামকে চিঠি লেখার জন্য এবং তারা লিখলো।

এরপর তারা অসংখ্য চিঠি হযরত হুসাইন রাঃ এর কাছে প্রেরণ করে। যার মূল বক্তব্য ছিল- পুরো ইরাক ইয়াযিদের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত। শুধু কুফার মাঝেই এক লাখ অস্ত্রধারী লোক হুসাইন রাঃ এর সহযোগিতায় প্রস্তুত। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯১)

শুধু তা'ই নয়, স্থানীয়রা ইয়াযিদ নির্ধারিত কুফার গভর্ণর নু'মান বিন বশীর রাঃ এ পিছনে জুমআর নামায পড়াও ছেড়ে দিয়েছে। লোকেরা হুসাইন রাঃ এর অনুরক্ত এবং তাকে ছাড়া কারো উপর ভরসা করছে না। তারীখে তাবারী-৫/৩৪৭]

এরকম অসংখ্য পত্র লিখে হযরত হুসাইন রাঃ কে কুফায় আসার জন্য প্রলুব্ধ করছিল শিয়ারা। শুধুমাত্র চিঠি পাঠিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি কুফাবাসী। পরপর চিঠির সাথে সাথে প্রতিনিধিদলও প্রেরণ করছিল হযরত হুসাইন রাঃ কে কুফায় আগমনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য। যেমন শিয়াদের লিখিত বইয়ের মাঝে এসেছে-

"তারা এ চিঠি দিলো উবায়দুল্লাহ বিন মুসমে হামাদানী এবং আব্দুল্লাহ বিন ওয়াল তাইমিকে এবং তাদেরকে দ্রুত যেতে বলল। তারা দ্রুত গেলো যতক্ষণ না তারা দশই রমযান মক্কাতে পৌঁছালো। এরপর কুফার লোকেরা দুদিন অপেক্ষা করলো এবং কায়েস বিন মুসাহহার সাইদাউই এবং আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ আরহাবি এবং আম্মারাহ বিন আব্দুল্লাহ সালুলিকে আবার পাঠালো একশত পঞ্চাশটি চিঠি দিয়ে যা এক, দুই, তিন অথবা চারজন লিখেছিলো।

এরপর আবার দু'দিন পর তারা হানি বিন হানি সাবেঈ এবং সাঈদ বিন আব্দুব্দুল্লাহ হানাফিকে দিয়ে একটি চিঠি পাঠালো যার বিষয়বস্তু ছিল এরকম: 'আল্লাহর নামে যিনি সর্ব দয়ালু, সর্ব করুণাময়। হোসেইন বিন আলী (আ.) এর প্রতি তার অনুসারীদের, বিশ্বাসীদের এবং মুসলমানদের পক্ষ থেকে। আম্মা বা'আদ, লোকজন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে এবং আর কোন মত পোষণ করবেন না, তাই দ্রুত আসুন, দ্রুত আসুন। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক'।

আরেকটি চিঠি লিখেছিলো শাবাস বিন রাবঈ, হাজ্জার বিন আবজার আজালি, ইয়াযিদ বিন হুরেইস বিন রুয়েইম শাইবানি, উরওয়া বিন কায়েস আহমাসি, আমর বিন হাজ্জার যুবাইদি এবং মুহাম্মদ বিন আমর তামিমি, যার বিষয় ছিলো এরকম: 'আম্মা বাআদ, বাগানগুলো সবুজ রং ধারণ করেছে এবং ফলগুলো পেকেছে। যদি আপনি চান, এখানে আসতে পারেন, সেনাদল আপনাকে রক্ষায় প্রস্তুত'।" [শিয়াদের লিখিত 'শোকার্তের দীর্ঘশ্বাস-১ম, পৃষ্ঠা-৬২।

উপরোক্ত পত্রাবালীর বিবরণ এবং প্রতিনিধিদলের বক্তব্য জানাচ্ছিল যে, হুসাইন রাঃ দ্রুত ইরাক এসে পরিস্থিতি শামাল না দিলে পুরো ইরাকে ব্যাপক হত্যাকা- শুরু হয়ে যাবে। কারণ, এখানকার অপরিপক্ক বৃদ্ধির অধিকারীরা অধৈর্য হয়ে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসবে। ফলে রক্তের বন্যা বইবে পুরো ইরাক জোরে।

হযরত হুসাইন রাঃ স্বীয় পিতার মত চিন্তা করলেন যে, গোঁয়ার টাইপের মুর্খ লোকদের দূরে ঠেলে না দিয়ে তাদের কাছে টেনে বুঝিয়ে সমঝিয়ে হক পথে রাখাটাই অধিক উপযোগী। যারা পাগলপাড়া হয়ে তাকে কাছে ডাকছে। তাদের নেতৃত্ব দেবার জন্য উদাত্ব আহবান করছে।

যদি তাদেরকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে নিজের কম বুদ্ধির কারণে অনর্থক রক্তক্ষয়ী কোন সংঘর্ষের জন্ম দিতে পারে।

তাই তাদের নেতৃত্ব দিয়ে তাদেরকে একতাবদ্ধ করে কম ক্ষতির মাধ্যমে উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভপর হবে বলে আশা করা যায়।

এ কারণেই তিনি বিপদকে মাথায় তুলে নিয়ে ইরাকে যাওয়াই উপযোগী মনে করলেন। তিনি আশাবাদী ছিলেন যে, ইরাকে আসলে, সেখানকার জনগণকে নিয়ে তার নেতৃত্বে একটি নতুন শক্তির উত্থান হবে। একদিকে ইরাকের বিশাল জনগোষ্ঠি অপরদিকে হেযাজে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর নেতৃত্বে জনসাধারণের বিরাট জামাত। দুইদিক থেকেই বিশাল জনতার একতবদ্ধ অবস্থান দেখে ঘাবরে গিয়ে ইয়াযিদ প্রশাসন হয়তো তাদের রাষ্ট্রনীতির পদ্ধতি পরিবর্তন করে খোলাফায়ে রাশেদীনের তরীকায় রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতিতে ফিরে যেতে বাধ্য হবে। তাহলে কোন প্রকার রক্তপাত ছাড়াই আমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে।

আর যদি ইয়াযিদ প্রশাসন তা না মানে, তবুও এ সম্মিলিত শক্তি কম ক্ষতির সম্মুখিন হয়েই ইয়াযিদ বাহিনীর উপর বিজয় লাভ করে ফেলবে। ফলে অল্প ক্ষতির মাধ্যমে বড় উপকার অর্জিত হবে বলে দৃঢ় আশা করা যায়।

মুসলিম বিন আকীল কুফায়

কুফাবাসীর এতো পত্র, এতো আহবানের পরও হযরত হুসাইন রাঃ তাড়াহুড়া করেননি। ইরাকী লোকদের পত্র ও প্রতিনিধিদলের বক্তব্য পুরাপুরি বিশ্বাস করেননি। বরং সত্যাসত্যি যাচাই করার জন্য তিনি তার চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আকীলকে প্রেরণ করে পরিস্থিতি সম্পর্কে সরেজমিন জানতে চান।

তাই কুফীদের কথার উপর ভরসা করে নিজে প্রথমে না গিয়ে মুসলিম বিন আকীলকে পাঠানোকে নিরাপদ মনে করলেন।

শিয়া রাবী আবূ মিখনাফ এর বর্ণনা হল, হুসাইন মুসলিম বিন আকীলের মাধ্যমে কুফাবাসীর কাছে এ পয়গাম পাঠান যে, 'হুসাইন বিন আলীর পক্ষ থেকে আহলে ঈমান ও মুসলমানদের প্রতি। হানী এবং সাঈদ আপনাদের পত্র আমার কাছে এনেছে। আপনাদের দূতদের মাঝে এ দুইজন সবার শেষে আসছে। যা কিছু হযরতরা লিখছেন যে, "আমাদের নেতৃত্ব দেবার কেউ নাই। আপনি আসুন। হয়তো আপনার মাধ্যমে হক ও হিদায়াতের আল্লাহ তাআলা আমাদের একত্র করে দিবেন"। এসব জেনে আমি আমার চাচাতো ভাই। যার উপর আমার আস্থা আছে। আর তিনি আমার পরিবারেরও অন্তর্ভুক্ত। তাকে আপনাদের কাছে পাঠালাম। আমি তাকে বলেছি যে, তিনি যেন আপনাদের অবস্থা এবং সবার রায় আমাকে পত্র লিখে পাঠায়। যদি তার পত্র দ্বারা এ কথাপ্রমাণিত
হয়ে যায় যে, আপনাদের দলের সংখ্যা এবং আপনাদের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা একথার উপর একমত, যে বিষয়ে আপনারা আমার কাছে পত্র লিখছেন এবং আমার কাছে দূত পাঠিয়েছেন। তাহলে খুব দ্রুতই আমি আপনাদের কাছে আসবো ইনশাআল্লাহ। তারীখে তাবারী-৫/৩৫৩] এ আখেরী পত্র দ্বারাও বুঝা যায় যে, হযরত হুসাইন রাঃ কোন যুদ্ধ করতে চাননি। কেবল কুফাবাসীর একতা ও সমর্থন চেয়েছেন।

হযরত মুসলিম বিন আকীল কুফায় আসলেন। কুফীরা বিশাল শো ডাউনের মাধ্যমে তাকে বরণ করেন। মুসলিম বিন আকীলের হাতে অল্প কয়েক দিনে প্রায় আঠারো হাজার লোক হুসাইন রাঃ এর নামে বাইয়াত হয়।

যাতে করে মুসলিম বিন আকীল বুঝেন যে, কুফীরা পত্রে যা লিখেছে এবং লোক পাঠিয়ে যা কিছু বলছে, এ সব কিছুই সত্য। তারা হযরত হুসাইন রাঃ এর জন্য জান দিতে প্রস্তুত। আর কুফায় এখানো ইয়াযিদের খেলাফত পূর্ণতা পায়নি। অধিকাংশ লোক ইয়াযিদের খেলাফতের

বিরোধী। কিন্তু আসলে এসবই ছিল তাদের প্রতারণা। তাদের মূল মাকসাদ ছিল যেন হযরতে হুসাইন রাঃ কুফায় আসেন। আর তারা তাদের মাকসাদ যা করতে পারে।

কুফায় তখন ইয়াযিদের খেলাফত মজবুত হয়ে গিয়েছিল। কুফায় তখন ইয়াযিদের গভর্নর ছিল হযরত নুমান বিন বশীর রাঃ। তিনি মুসলিম বিন আকীলের আগমণ এবং বাইয়াত সম্পর্কিত বিষয় জানার পরও কোন এ্যাকশনে যাননি।

এতে কেউ কেউ আপত্তি তুললে নুমান বিন বাশীর রাঃ বলেন, আল্লাহর আনুগত্যে থেকে দুর্বল থাকা আমার পছন্দ, আল্লাহর নাফরমানীতে শক্তিশালী হবার চেয়ে। [তারীখে তাবারী-৫/৩৪৮]
তিনি মুসলিম বিন আকীলের সাথীদের বলেন, 'আমি সন্দেহের বশে তোমাদের গ্রেফতার করবো না। তবে যদি একথা জানতে পারি যে, তোমরা খলীফার বাইয়াত ভেঙ্গেছো, এবং রাষ্ট্রদ্রোহ করছো, তাহলে আল্লাহর কসম! আমি তলোয়ার ব্যবহার কতে কুণ্ঠিত হবো না'। [তারীখে তাবারী-৫/৩৪৮]

একজন গভর্নর হিসেবে নুমান বিন বশীর রাঃ নিশ্চয় মুসলিম বিন আকীলের যাবতীয় কার্যক্রম নজরে রাখছিলেন। কিন্তু তারপরও মুসলিম বিন আকীলকে গ্রেফতার না করা একথাই প্রমাণ করে যে, হযরত নুমান বিন বশীর রাঃ এর কাছে মুসলিম বিন আকীলের কার্যক্রমকে রাষ্ট্রদ্রোহ বলে মনে হয়নি। যদি এমন কিছু হতো, তাহলে তিনি অবশ্যই এ্যাকশনে যেতেন।

মুসলিম বিন আকীলের আশ্বাসমূলক পত্র প্রেরণ

মুসলিম বিন আকীল কুফাবাসীর প্রতারণা বুঝতে না পেরে তাদের বাহ্যিক উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা ও সহযোগিতা দেখে খুশি খুশি পত্র প্রেরণ করেন হযরত হুসাইন রাঃ এর কাছে। যাতে তিনি জানান যে, বার হাজার লোক আমার হাতে বাইয়াত হয়ে গেছে। প্রচুর লোক বাইয়াত হতে আসছে। আপনি দ্রুত কুফায় চলে আসুন। [তারীখে তাবারী-৫/৩৪৮]
এক বর্ণনায় আসছে যে, তিনি লিখেন: সমস্ত কুফাবাসী আপনার সাথে আছে। আপনি আমার চিঠি পেতেই চলে আসুন। আনছাবুল আশরাফ বালাজুরীকৃত-৩/১৬৭/

এ পত্র ৬০ হিজরীর জিলকদ মাসের এগার তারিখে পাঠানো হয়। [তারীখে তাবারী-৫/৩৮১, ৫/৩৯৫]

হযরত হুসাইন রাঃ এর কুফায় যাবার প্রস্তুতি

হযরত হুসাইন রাঃ এর কাছে মুসলিম বিন আকীলের পত্র আসতেই তিনি কুফায় রওনার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। এ সফরে তাঁর পরিবারের অল্প কিছু ব্যক্তি ছাড়া আর কোন মুসলমান এটিকে সমর্থন করেননি। বরঞ্চ বরং বড় সাহাবাগণ এবং তাঁর নিকটাত্মীয়গণ যথাসম্ভব কুফায় যেতে বারণ করতে থাকেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ খুব বুঝালেন যে, মক্কার বাইরে যাবেন না। কুফায় যাবার ইচ্ছে পরিত্যাগ করুন। এটাকে একটা ষড়যন্ত্র মনে হয়। যেভাবে আপনার পিতা আলী রাঃ কে ওরা হত্যা করেছে কুফাবাসী। ওরা আপনার বাবা ও ভাই হাসান রাঃ এর সাথে গাদ্দারী করেছে ওরা। এমনিভাবে আপনার সাথেও এরা গাদ্দারী করবে।

তারা উভয়ে খুব বুঝালেন। যেভাবে তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান গনী রাঃ কে তার পরিবারের সামনে হত্যা করা হয়েছে। না জানি ওরাও আপনাকে আপনার পরিবারের সামনেই হত্যা করে। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/৩০৩]

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ একথা বলতে থাকেন যে, যদি আমি বুঝতাম যে, আমি বাঁধা দিলে তুমি যাবে না, তাহলে আমি তোমার মাথা ও দাড়ি ধরে বাঁধা দিতাম।

তারপর হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ দৌড়াতে দৌড়াতে হযরত হুসাইন রাঃ এর ঘোড়ার লাগাম ধরে বললেন, যদি আপনি যেতেই চান, তাহলে অন্তত সন্তান সন্তুতি এবং পরিবারের সদস্যদের রেখে যান। তাদের এ বিপদের মুখে নিয়ে যাবেন না। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৬৪-১৬৫, এরাবিক, ৮/৩০১-২, বাংলা, তারীখে তাবারী-৩৮৩-৩৮৪]

হুসাইন রাঃ এর ভাই মুহাম্মদ বিন আলী হানফিয়্যাহ ও সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন ভাইকে সফরে বাঁধা দিতে। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৬৫, আরবী, ৮/৩১১-৩১২, বাংলা]

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাঃ হযরত হুসাইন রাঃ কে বুঝাতে বলেন,

اتق الله في نفسك، وألزم بيتك، ولا تخرج على امامك

আল্লাহকে ভয় কর। নিজের ঘরে বসে থাকো। নিজের ইমাম ইয়াযিদের বিরুদ্ধে যেও না। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৬৩]

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাঃ বলেন,

كلمت حسينا، فقلت له: اتق الله، ولا تضرب الناس بعضهم ببعض

আমি হুসাইন রাঃ কে এ বিষয়ে কথা বলে বললাম, তুমি আল্লাহকে ভয় কর। লোকদের পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত করিও না। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৬৩]

হুসাইন রাঃ এর চাচাতো ভাই এবং বোন জামাতা হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফর রাঃ সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন হযরত হুসাইন রাঃ কে কুফায় যেতে বাঁধা দিতে। কিন্তু তার কথাও তিনি মানলেন না।

[তারীখে তাবারী- ৫/৩৮৭-৩৮৮]

আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর বাঁধা প্রদান

قَالَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِلْحُسَيْنِ: أَيْنَ تَذْهَبُ إِلَى قَوْمٍ قَتَلُوا أَبَاكَ وَطَعَنُوا أَخَاكَ؟ فَقَالَ: لِأَنْ أَقْتَلَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تُسْتَحَلُّ بِي يَعْنِي مَكَّةَ

আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ হুসাইন রাঃ কে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছো, তুমি কি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছো, যারা তোমার পিতাকে হত্যা করেছে আর তোমার ভাইকে অপবাদ দিয়েছে। তখন তিনি বললেন, অমুক কিংবা তমুক স্থানে নিহত হওয়া আমার কাছে আমার কারণে মক্কা হালাল (হত্যা বৈধস্থান) হওয়া থেকে উত্তম। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৬১, আরবী, ৮/৩০৪ ইফাবা]

এই সকল আত্মীয় স্বজন, কিবারে সাহাবাগণ সকলেই হযরতে হুসাইন রাঃ কে কখনো কোমল সুরে, কেঁদে কেঁদে, কখনো কঠোরতার সাথে বাঁধা দেবার চেষ্টা করেন। কুফার লোকেরা ধোঁকাবাজ। এরা প্রতারক। ওদের চিঠির বক্তব্য আর বাস্তবতা এক নয়। তাই সেখানে যাওয়া নিজেকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেয়া। তাছাড় ইয়াযিদের খেলাফত পূর্ণতা পেয়েছে। সুতরাং এখন ভিন্ন কিছু চিন্তা করা মানে রাষ্ট্রদ্রোহীতা হবে। তাই সেখানে যাওয়া কিছুতেই উচিত হবে না।

কিন্তু হুসাইন বিন আলী রাঃ নিচের সিদ্ধান্তে অনড় রইলেন। পরিবারসহ তিনি প্রসিদ্ধ কওল অনুপাতে জিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখ মক্কা থেকে কুফার উদ্দেশ্যে রওনা হন। তবে রাজেহ কওল হল, হযরত হুসাইন রাঃ এর আগেই রওনা হন। [তারীখে উম্মতে মুসলিমাহ, ইসমাঈল রেহানকৃত-২/৪৭৬]

সঙ্গী ছিলেন পরিবারের ৮২ সদস্য এবং কুফার ৬০ জন শিয়া। তিনি যাবার সময় সাথে কুফাবাসী শিয়াদের লিখিত পত্রও নিয়ে নেন। [তারীখে দামেশক-৪/২০২]

মক্কা থেকে কারবালার দূরত্ব ত্রিশ মনজিল। সেই জমানায় মনজিল ছাড়া এদিক সেদিক বিরতি দেয়া হতো না। সেই হিসেবে কাফেলা প্রতিদিন এক মনজিল সফর করতো। এভাবে সফর করে দশে মুহাররমে কারবালা প্রান্তরে পৌঁছে যান।

হযরত হুসাইন রাঃ এতো বাঁধার পরও কেন থামলেন না?

এতো বড় বড় ব্যক্তিত্ব, মুখলিস স্বজন ও প্রিয়জনদের এতো বাঁধার পরও কেন হযরতে হুসাইন রাঃ নিজের সিদ্ধান্তে অটল রইলেন? তিনি কি ক্ষমতার লোভী ছিলেন? নাউজুবিল্লাহ!

অবশ্যই নয়। তিনি একথা বুঝতে পারছিলেন যে, কুফা যাওয়া ছাড়া এ সমস্যার সমাধান হবে না।

দ্বিতীয়ত মক্কার গভর্ণরের পক্ষ থেকে এ শংকা ছিল যে, সুযোগ পেলেই জোরপূর্বক বাইয়াত গ্রহণ করাতে চাইবে ইয়াযিদের নামে। বাইয়াত নিতে চাইলে যে মতানৈক্য তৈরী হবে এতে করে পবিত্র শহরে রক্তপাতের সম্ভাবনা আছে। তবে অন্যান্য সাথীদের কথামত বাইয়াত নিয়ে ঘরে থাকলে অবশ্যই নিরাপত্তা পাওয়া যেতো। শরীয়তে এর সুযোগও ছিল।

কিন্তু তার মত ব্যক্তিত্বের জন্য হাত গুটিয়ে বসে থাকা শোভা পায়নি। তাই তার কাছে ইজতিহাদ অনুপাতে দৃঢ়তার উপর অটল থাকাকে যথার্থ বলে মনে হয়েছে। যাতে করে ইসলামী হুকুমতের উপর এক খান্দানের প্রতিপত্তির রেওয়াজ বন্ধ হয়। এ কারণেই তিনি শত বাঁধা বিপত্তির পরও নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকে কুফা যাবার পক্ষেই অনড় থাকেন।

কুফায় অবস্থার পরিবর্তন ও আব্দুল্লাহ বিন যিয়াদের নিয়োগ

মুসলিম বিন আকীলের পত্র পৌঁছতে তিন চার সপ্তাহ লেগেছে। এর মাঝে কুফার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। যে ব্যাপারে হযরত হুসাইন রাঃ কিছুই জানতেন না। ঘটনা হল, কুফার কঠোরমনস্ক লোকেরা গভর্ণর মুসলিম বিন আকীল বিষয়ে নুমান বিন বশীর রাঃ এর কোমল আচরণ পছন্দ করছিল না। প্রথমে তাকে নানা কথা বলে ক্ষুব্ধ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু নুমান বিন বশীরের অবিচলতা থেকে তারা ইয়াযিদের কাছে এ বিষয়ে নালিশ দিয়ে চিঠি পাঠায়। আজগুবি ও বানোয়াট কথা মিশ্রিত পত্রে ইয়াযিদকে ক্ষিপ্ত করা। যাতে করে তিনি নুমানকে বরখাস্ত করেন।

প্রথম পত্রটি পাঠায় এক খৃষ্টান। যার ব্যাপারে ইয়াযিদ ছিল বেখবর। ইয়াযিদ ওদের কথায় প্রলুব্ধ হয়ে নুমান বিন বশীরের মত বয়োজেষ্ঠ এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বুযুর্গ ব্যক্তিকে বরখাস্ত করে দেয়। বসরার গভর্ণর উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে বসরার সাথে কুফার নতুন গভর্ণর হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করে।

উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ ছিল কঠোর হৃদয়ের অধিকারী এবং দায়িত্ব পালনে ছিল কট্টর। উবায়দুল্লাহ দায়িত্ব পেতেই বসরা থেকে কুফায় চলে আসে। এ সময় মুসলিম বিন আকীল শহরের এক সরকারী আমীর হানী বিন উরওয়াহ এর ঘরে ছিলেন। উবায়দুল্লাহ গোয়েন্দা মারফত এ সংবাদ জানতেই হানী বিন উরওয়াহকে ডেকে পাঠান।

জিজ্ঞাসাবাদে তিনি মুসলিম বিন আকীল কোথায় তা বলতে অস্বিকৃতি জানান। এতে উবায়দুল্লাহ ক্ষীপ্ত হয়ে তাকে জেলে বন্দী করেন।

মুসলিম বিন আকীলকে হত্যা

এ পরিস্থিতিতে মুসলিম বিন আকীলও একটি মারাত্মক ভুল করে বসেন। যার ফলে পুরো ঘটনাই পাল্টে যায়। তিনি তার মেজবান হানী বিন উরওয়াহকে জেল থেকে উদ্ধার করতে অস্ত্রসহ চার হাজার লোক নিয়ে ময়দানে নেমে আসেন। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯১, ৫/৩৪৯-৩৫০, আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৫৪, ৮/২৯২ বাংলা]
যখন এ বিশাল বাহিনী নিয়ে গভর্ণরী ভবনের দিকে রওনা হন তখন শুরুতে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু দ্রুতই কুফার পুরানো প্রতারণার অভ্যাস প্রকাশ পেয়ে যায়।

মুসলিম বিন আকীল যখন আক্রমণ করতে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন একে একে তার সাথে শরীক কুফী শিয়ারা সটকে পড়তে শুরু করে।

মা তার ছেলের কাছে, বোন তার ভাইয়ের কাছে এসে বলতে লাগল, বাড়িতে ফিরে চল। লোকেরা তোমাদের বাঁধা দিবে। তদ্রুপ পিতা পুত্রকে এবং ভাই ভাইকে বলতে লাগল, কাল যখন শামের ফৌজ এসে পৌঁছবে তখন তুমি কিভাবে তাদের হাত থেকে নিস্তার পাবে? তখন লোকেরা মুসলিম বিন আকীলকে অসহায় অবস্থায় রেখে একে একে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে পড়ল এবং দেখা গেল তাঁর সাথে পাঁচশ যোদ্ধা বাকি আছে।

এরপর তাদের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে তিনশ" তারপর ত্রিশে দাঁড়াল। তিনি তাদেরকে নিয়ে মাগরিব নামায পড়লেন এবং আবওয়াবে কিন্দা অভিমুখী হলেন। আর সেখান থেকে দশজন নিয়ে বের হলেন। তারপর এরাও সটকে পড়ল। তখন তিনি সম্পূর্ণ একাকী হয়ে পড়লেন। তাঁর সাথে না থাকলো পথ দেখানোর মত কেউ, কিংবা অন্তরঙ্গতা দান করার মত কেউ, কিংবা নিজ গৃহে আশ্রয় দান করার মত কেউ।

তখন তিনি অজানা গন্তব্যের পথে বেরিয়ে পড়লেন। আর এদিকে অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আসছিল। আর তিনি উদ্দেশ্যহীনভাবে একাকী রাস্তায় পথ চলছিলেন। এভাবে তিনি এক গৃহদ্বারে এসে উপস্থিত হলেন। করাঘাত করলে ত্বওয়া নামক এক স্ত্রীলোক বের হল, আর সে ছিল আল আশআছ বিন কায়েশের ঐরষে সন্তান জন্মদানকারিণী বাঁদী। তিনি পানি চাইলেন। পানি পান করে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, হে আল্লাহর বান্দী! এই শহরে আমার কোন বাড়ি ঘর কিংবা স্বজন পরিজন কেউ নেই। তোমার কি আমার প্রতি একটু সদাচার ও অনুগ্রহ করার সুযোগ আছে? যার পুরস্কার আমি পরে তোমাকে দিবো। কুফার লোকেরা আমাকে ধোঁকা দিয়েছে। আমার সাথে মিথ্যা বলেছে। তখন উক্ত বাঁদী নিজ গৃহে মুসলিমকে আশ্রয় দেন। নিরাপদ ঘরে থাকতে দেন।

ত্বওয়ার ছেলে এসে যখন বিষয়টি জানল। তখন পরদিন সকালে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ পর্যন্ত এ খবর জানিয়ে দিল। উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ মুসলিম বিন আকীলকে পাকরাও করে নির্মমভাবে হত্যা করে লাশ ছাদ থেকে ফেলে দেয়। হানী বিন উরওয়াকেও হত্যা করে। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৫৫-১৫৭, আরবী, ৮/৩৯৩-৩৯৭, বাংলা, তারীখে তাবারী-৫/৩৯২, ৫/৩৫০]

[টপিক:(ইয়যিদের শাসনামল থেকে মুসলিম বিন আকিলকে হত্যা) আইওএম,পঞ্চম সেমিস্টার সিরাত শীট থেকে সংগৃহিত]

হুসাইনের বিরুদ্ধে ইবনু যিয়াদের প্রস্তুতি

ইয়াযিদ কুফার গভর্নর হিসেবে ইবনু যিয়াদকে নিয়োগ দেয়। কারণ সে জানত, ইবনু যিয়াদ হুসাইনের মোকাবেলায় কখনো পিছপা হবে না। তাকে দমন করতে যা কিছু করা দরকার, তার সবই সে করবে। ইবনু যিয়াদও তার কাজকর্মে এর প্রমাণ দেখায়।

হুসাইন তার সাথিদের নিয়ে কুফায় আসছেন, ইবনু যিয়াদ এ খবর পেয়ে যায়। তখনই সে তার পুলিশ প্রধান হুসাইন ইবনু তামিমকে কাদিসিয়ার উদ্দেশে পাঠিয়ে দেয়। তাকে এ নির্দেশ দেয়, 'তুমি এখনই কাদিসিয়ায় যাও। সেখানে পৌঁছে হুসাইনের মোকাবেলার প্রস্তুতি নাও।'

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন হাজির নামক স্থানে পৌঁছান, তখন তার বিশেষ দূত কাইস ইবনু মুসহিরের হাতে কুফাবাসীর কাছে একটি আগাম চিঠি পাঠিয়ে দেন। চিঠিতে হুসাইন তার আগমনি-সংবাদ জানান; সেইসাথে এর আগে কুফাবাসী তাকে যে উদ্দেশ্যে চিঠি পাঠিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, সেই কাজে তাদের পূর্ণ সমর্থনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

হুসাইনের দূতের বীরোচিত শাহাদাত

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর চিঠি নিয়ে কাদিসিয়ায় পৌঁছে যান কাইস। ইবনু যিয়াদের সেনাবাহিনী আগে থেকেই সেখানে ওত পেতে বসে ছিল। তাই কাইস সেখানে পৌঁছামাত্রই তাদের হাতে বন্দি হন। তাকে পাঠানো হয় ইবনু যিয়াদের কাছে।

ইবনু যিয়াদ তার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়, 'তাকে প্রাসাদের ছাদে নিয়ে যাও। সেখানে তাকে দাঁড় করিয়ে হুসাইনকে (আল্লাহ মাফ করুন) গালমন্দ ও অপমান করতে বাধ্য করো।'

নির্দেশমতো কাইসকে ছাদে নিয়ে যাওয়া হয়। দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় সবচেয়ে উঁচু কার্নিশে। সেখানে দাঁড়িয়ে কাইস শুরুতেই আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করেন। তারপর দরাজ কণ্ঠে বলেন, 'হে কুফাবাসী, হুসাইন ইবনু আলি হলেন নবিকন্যা ফাতিমার কলিজার টুকরো। সমগ্র পৃথিবীর বিচারে তিনি শ্রেষ্ঠ ও অনন্য মানুষ। বর্তমানে তিনি হাজির নামক স্থানে এসে পৌঁছেছেন। আমি তারই দূত। আমাকে তিনি তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। তোমরা তাকে সাদরে স্বাগত জানাও!'

এরপর কাইস গালমন্দ করেন ইবনু যিয়াদকে। আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রশংসা এবং তার মাগফিরাতের দুআ করেন।

কাইসের এমন সাহস দেখে ইবনু যিয়াদের মাথায় খুন চড়ে যায়। তখনই সে নির্দেশ দেয়, 'তাকে ছাদ থেকে নিচে ফেলে দাও!'

জালিম সৈন্যরা তার নির্দেশ পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তারা কাইস ইবনু যিয়াদকে ছাদ থেকে নিচে ফেলে দেয়। নিচে পড়তেই তার দেহখানি হয়ে যায় টুকরো টুকরো। এভাবেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,ইবনু কাসির, খন্ড :১১,পৃষ্ঠা :৫১৩]

আব্দুল্লাহ ইবনু মুতির সাক্ষাৎ

কুফার কাছাকাছি এগিয়ে আসেন হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু। পথিমধ্যে তার সাক্ষাৎ হয় আব্দুল্লাহ ইবনু মুতির সাথে। হুসাইনকে দেখে দাঁড়িয়ে যান ইবনু মুতি। তাকে বলেন, 'আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনি কোথায় যাচ্ছেন? উদ্দেশ্য কী আপনার?'

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে সব কিছু খুলে বলেন।
সব শুনে আব্দুল্লাহ ইবনু মুতি বলেন, 'হে নবি-বংশের আলো, আমি আপনাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সম্মানের দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি আপনার সংকল্প থেকে ফিরে আসুন। আল্লাহর কসম, কসম কুরাইশ ও আরবের ইজ্জতের! আপনি যদি বনু উমাইয়ার কাছ থেকে শাসনক্ষমতা নিতে চান, তবে তারা আপনাকে শহিদ করে দেবে। আল্লাহ না করুন-যদি এমন হয়ে যায়, তবে পৃথিবীতে আর এমন কেউ থাকবে না, যাকে তারা পরোয়া করবে। আপনার জীবনের সাথে ইসলাম, আরব সর্বোপরি কুরাইশদের ইজ্জত ও সম্মান মিশে আছে। আপনি এমনটি করবেন না। কুফায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করুন। উমাইয়াদের হাতে জীবন বিলিয়ে দেওয়ার কোনো মানে নেই।'(আল-কামিল ফিত তারিখ,ইবনুল আসির,খন্ড :৩, পৃষ্ঠা:১৫১)

হুসাইনি বাহিনীর পরামর্শসভা

মুসলিম ইবনু আকিল বন্দি হওয়ার সময় মুহাম্মাদ ইবনু আশআস থেকে একটি ওয়াদা নেন। তাতে তিনি বলেন, 'আমার অবস্থা হুসাইনকে জানিয়ে বলবেন, তিনি যেন রাস্তা থেকেই ফিরে যান; কুফায় না আসেন।'

মুহাম্মাদ ইবনু আশআস তার ওয়াদা পূরণে উদ্যোগী হয়। তখনই একজন দূত পাঠিয়ে দেয় হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে। লোকটি এসে পথিমধ্যে হুসাইনের সাথে সাক্ষাৎ করে, তাকে সবকিছু জানায়।

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন সালাবিয়া নামক স্থানে এসে পৌঁছান। তখনই ওই লোকের কাছ থেকে সংবাদ পান। সাথে সাথে আরেকটি মাধ্যম থেকে ইবনু আকিলের শাহাদাতের হৃদয়বিদারক সংবাদটি শুনতে পান।

এসব সংবাদ শুনে হুসাইনের কিছু সাথি ঘাবড়ে যায়। তারা তার কাছে জোর আবেদন জানায়, 'আপনি এখান থেকেই ফিরে চলুন। কুফায় আপনার কোনো সাথি বা সাহায্যকারী নেই। আমাদের প্রবল আশঙ্কা হচ্ছে, কুফার যে লোকেরা আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, তারাই এবার আপনার বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে।'।[তারিখুল তাবারি,ইবনু জারির আত-তাবারি,খন্ড:৫,পৃষ্ঠা:৩৯৭]

ইবনু আকিলের শাহাদাতের প্রতিশোধ

মুসলিম ইবনু আকিলের শাহাদাতের সংবাদ যখন তার গোত্রের লোকেরা পায়,
তখন তারা প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। তার নির্মম হত্যার প্রতিশোধ নিতে তারা প্রতিজ্ঞা। করে, 'আমরা ইবনু আকিলের রক্তের বদলা আমরা নিয়েই ছাড়ব, আর তা যদি না পারি তার মতো জীবন বিলিয়ে দেব।'

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এবার স্পষ্ট হয়ে যায়, কুফায় তার কোনো আশার আলো নেই। তিনি যে দ্বীনি উদ্দেশ্য নিয়ে সেখানে যেতে চাইছেন, নেই তার বাস্তবায়নের সুযোগ। কিন্তু ইবনু আকিলের গোত্রের লোকেদের প্রতিশোধ স্পৃহা দেখে আর ইবনু আকিলের বিচ্ছেদ বেদনায় প্রভাবিত হয়ে তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'তাদের পরে আর এভাবে বেঁচে থাকায় কোনো কল্যাণ দেখছি না।'

তখন তার সাথিদের অনেকেই বলেন, 'আপনি তো মুসলিম ইবনু আকিল নন। আপনার মর্যাদা অন্যরকম। আমাদের বিশ্বাস-কুফাবাসী যখন আপনাকে দেখবে, আশা করি তারা তখন আপনার পক্ষে চলে আসবে।' [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খন্ড :১১,পৃষ্ঠা:৫১৪;আল কামিল ফিত তারিখ,খন্ড :৩, পৃষ্ঠা:১৫২]

এ বিষয়টি নিয়ে কিছুক্ষণ নানা আলোচনা ও পর্যালোচনা চলে। তারপর সিদ্ধান্ত হয়, সামনে এগিয়ে যাওয়া হবে। ফলে তারা চলতে চলতে যিয়ালা নামক স্থানে এসে পৌঁছান। তাঁবু ফেলেন এখানে।

চলার পথে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাফেলা যেদিক দিয়ে যায়, লোকজন জেনে যায় তার উদ্দেশ্যের কথা। ফলে বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ শরিক হতে থাকে তার সাথে। যিয়ালা থেকেও কিছু লোক শরিক হয় হুসাইনের কাফেলায়।

যিয়ালা পৌঁছে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু আরেকটি বেদনাদায়ক সংবাদ পান। তার দুধভাই আব্দুল্লাহ ইবনু লাকিত-যাকে তিনি যাত্রাপথে মুসলিম ইবনু আকিলের কাছে পাঠিয়েছেন-তাকেও শহিদ করে দেওয়া হয়েছে।(আল -বিদায়া ওয়ান নিহায়া,খন্ড:১১,পৃষ্ঠা:৫৫২)

সাথিদের ফিরে যাওয়ার অনুমতি

এ সংবাদ শোনার পরপরই হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সাথিদের ডাকেন। সবাই একত্র হলে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, 'শোনো সবাই, কুফাবাসী আমাদের ধোঁকা দিয়েছে। আমাদের সমর্থক ও সাহায্যকারীরাও সটকে পড়েছে। এখন যদি কারও মন চায় আমার সাথে থাকবে না, তাহলে চলে যেতে পারো। আমি কারও দায় নিতে চাই না।'
এ ঘোষণার সাথে সাথে কাফেলায় আলোড়ন জাগে। পথ থেকে জুড়ে যাওয়া লোকগুলো ডান-বাম করে কেটে পড়তে থাকে। এ পর্যায়ে এসে হুসাইনের সাথে কেবল মক্কা থেকে সঙ্গী হওয়া লোকজনই থেকে যান।

কাফেলা এখান থেকে রওনা হয়ে আকাবা নামক স্থানে পৌঁছে। তখন এক আরবীয়ের সাথে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাক্ষাৎ হয়। লোকটি কসম করে তাকে অনুরোধ করেন, 'আল্লাহর রাসুলের দৌহিত্র, ফিরে যান। আপনি নিশ্চিত তির, বল্লম, তরবারির দিকে ছুটে চলেছেন। যাদের আশ্বাসে আপনি রওনা হয়েছেন, তারা যদি আপনার হয়ে কুফায় থাকা আপনার শত্রুদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করত কিংবা কুফা থেকে তাদের বের করে দিয়ে আপনাকে বরণ করে

নিতে চাইত, তাহলে আপনার সেখানে যাওয়াটা ঠিক ছিল। কিন্তু বিষয়টি এখন আর এরকম নেই। তাই এ পরিস্থিতিতে কোনোভাবেই আপনার কুফায় যাওয়া ঠিক হবে না।'

হুসাইন তাকে বলেন, 'তুমি যে পরিস্থিতির কথা বলছ, তা আমারও অজানা নয়। কিন্তু আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্যলিপি কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না।'[আল-কামিল ফিত তারিখ, খন্ড:৩,পৃষ্ঠা:১৫২,তারিখুত তাবারি, খন্ড:৫, পৃষ্ঠা :৩৯৯]

হুর ইবনু ইয়াযিদের সেনাবাহিনী

চরাচরে তখন দুপুর। হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সাথিদের নিয়ে পথ চলছেন। হঠাৎ একটি দৃশ্যে চোখ আটকে যায়। দেখেন দূর থেকে একটা বিশাল ঝাঁক এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। সেদিকে ভালোভাবে তাকিয়ে বুঝতে পারেন, এটা অশ্বারোহী বাহিনী।

তখনই হুসাইন তার সাথিদের নিয়ে পাশের পাহাড়ের দিকে ছুটে যান। সেখানে পৌঁছে শুরু করেন যুদ্ধের প্রস্তুতি। তারা তখনো প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সেই মুহূর্তে তাদের সামনে এসে হাজির হয় ১ হাজার সেনার সশস্ত্র বাহিনী। তাদের নেতৃত্বে আছে হুর ইবনু ইয়াযিদ।

হুসাইন রাযিয়য়াল্লাহু আনহু তার সাথিদের নির্দেশ দেন, 'সবাই তৃপ্তি সহকারে পানি পান করে নাও। আর পশুগুলোকেও ভরপেট পানি পান করাও।'

হুসাইন ইবনু তামিম কাদিসিয়ায় যে সেনাবাহিনী নিয়ে এসেছে, সেখান থেকে হুর ইবনু ইয়াযিদকে ১ হাজার সেনার একটি বাহিনী দিয়ে এখানে পাঠায়। হুর ইবনু
ইয়াযিদ এসে হুসাইনের মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে যায়। এদিকে তখন যুহরের সালাতেন সময় হয়ে আসে।

হুসাইনের পেছনে শত্রুপক্ষের সালাত

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু মুয়াজ্জিনকে আজান দিতে বলেন। আজান হয়ে গেলে সবাই সালাতের জন্য জড়ো হয়ে যায়। তখন বিরোধী দলকে লক্ষ্য করে একা ভাষণ দেন তিনি। ভাষণের ভাষ্য ছিল এমন-

'হে লোকসকল, আল্লাহকে সামনে রেখে তোমাদের বলছি-আমি এখানে নিজ থেকে এসে উপস্থিত হইনি। তোমাদের অসংখ্য চিঠিপত্র এবং অনেক প্রতিনিধিদল আমার কাছে উপস্থিত হয়ে বারবার অনুরোধ করেছে, আমন্ত্রণ জানিয়েছে। তারা আমাকে বলেছে, আমাদের কোনো আমির নেই। আপনি এসে গেলে আল্লাহ তাআলা হয়তো আপনাকে আমাদের হিদায়াতের মাধ্যম বানাবেন। তাই আমি তোমাদের আহ্বানেই এখানে এসেছি। এখন যদি তোমরা তোমাদের অঙ্গীকারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকো, তবে আমি কুফায় প্রবেশ করব। আর যদি তোমাদের মন বদলে গিয়ে থাকে অথবা আমার আগমন তোমাদের প্রত্যাশার বাইরে হয়ে থাকে-তাহলে আমি যেখান থেকে এসেছি, সেখানেই চলে যাচ্ছি।'

ভাষণের সময় সবাই চুপচাপ থাকে। ভাষণ শেষ হলে হুসাইন মুয়াজ্জিনকে ইকামত দিতে বলেন। সেইসাথে হুর ইবনু ইয়াযিদকে বলেন, 'তুমি তোমার বাহিনী নিয়ে চাইলে আমাদের সাথেও সালাত পড়তে পারো অথবা আলাদা পড়তে পারো।'

হুর ইবনু ইয়াযিদ বলে, 'আপনিই সালাত পড়ান। আমরা সবাই আপনার পেছনে সালাত আদায় করব।'

যুহরের সালাতে ইমামতি করেন হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু। সালাত শেষে তিনি সাথিদের নিয়ে তার জায়গায় চলে আসেন। হুরও তার বাহিনী নিয়ে চলে যায় তার জায়গায়।

আসরের সালাতের সময়েও একই দৃশ্য দেখা যায়। এবারও ইমামতি করেন হুসাইন। শত্রুমিত্র সবাই তার পেছনে কাতার বেঁধে দাঁড়িয়ে যায়। আসরের পরেও যুহরের মতো একটি ভাষণ দেন তিনি।
(তারিখুত তাবারি, খণ্ড: ৫. পৃষ্ঠা: ৪০০-৪০১: আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,)

ময়দানে হুসাইনের দ্বিতীয় ভাষণ

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু ভাষণের শুরুতে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করেন। তারপর সবাইকে লক্ষ্য করে বলেন-

'শোনো লোকসকল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, সত্যপন্থিদের চিনতে পারো, তাহলে এটাই হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের কারণ। আমরা নবি-পরিবারের সদস্য। এ হিসেবে খিলাফত বিষয়ে তাদের (বনু উমাইয়ার) চেয়ে বেশি হকদার। তারা অধিকারের বাইরে গিয়ে এটা দখল করে রেখেছে। তোমাদের ওপর জুলুমের শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। যদি তোমরা আমাদের প্রতি খুশি না থাকো, আমাদের অধিকার বিষয়ে থাকো অজ্ঞ; তাছাড়া যদি তোমাদের সিদ্ধান্ত চিঠির মতো না থাকে-যে চিঠিগুলো তোমরা প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে পাঠিয়েছ, তাহলে আমি ফিরে যাচ্ছি।'

এসময় হুর ইবনু ইয়াযিদ বলে, 'আপনি যে চিঠি ও প্রতিনিধিদলের কথা বললেন, সেগুলো কে কখন পাঠিয়েছে-তার কিছুই আমাদের জানা নেই।'

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন দুটো থলে বের করেন। থলেদুটো চিঠি ও চিরকুটে ভরপুর। সেগুলো বের করে তাদের সামনে রাখেন।

এসব দেখে হুর বলে, 'আমরা এ চিঠিগুলো লিখিনি। আর আমরা গভর্নরের কাছ থেকে এ মর্মে আদেশ পেয়েছি, আপনাকে কুফায় ইবনু যিয়াদের কাছে পৌঁছে দেব। এছাড়া আপনাকে ছাড়ব না।'

হুসাইন বলেন, 'তার কাছে গিয়ে বশ্যতা স্বীকার করার চেয়ে মরে যাওয়াই উত্তম।'

এরপর তিনি সাথিদের দিকে ফিরে আদেশ করেন, 'তোমরা প্রস্তুত হও। আমরা মক্কায় ফিরে যাব।'

এসময় হুর ইবনু ইয়াযিদ এসে তাকে বাধা দেয়।

হুসাইন বলেন, 'তোমার মা তোমার জন্য কাঁদুক, তুমি কি এটা চাও?'

এ কথায় হুর বলে ওঠে, 'আল্লাহর কসম, আপনি ছাড়া যদি আর কেউ আমার মায়ের নাম মুখে আনত, তার খবর করে ফেলতাম। তাকেও তার মায়ের নাম নিয়ে সেভাবে বলতাম। কিন্তু আপনার মায়ের নামের সাথে মন্দ কিছু সংযোগ করার সাধ্য কারও নেই।

হুসাইন বলেন, 'আচ্ছা বলো, তোমার ইচ্ছা কী? কী করতে চাইছ?'

হুর বলে, 'আমার ইচ্ছা এটুকুই-আপনাকে ইবনু যিয়াদ পর্যন্ত পৌঁছে দেব।'

হুসাইন বলেন, 'আমি কখনোই তোমার সাথে তার কাছে যাব না।'

হুর বলে, 'তাহলে আমিও আপনাকে কোথাও যেতে দেব না।'

এভাবে তাদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ কথা কাটাকাটি চলতে থাকে।

হুর ইবনু ইয়াযিদের সত্য-স্বীকার

একপর্যায়ে হুর ইবনু ইয়াযিদ বলে ওঠে, 'আপনাকে হত্যা করার নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয়নি; বরং কুফায় পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত আপনার ছায়াসঙ্গী হয়ে থাকতে বলা হয়েছে। তাই আপনি এমন একটি পথ অবলম্বন করুন-যেটি না আপনাকে মদিনায় পৌঁছে দেবে, না কুফায়। যাতে আমি ইবনু যিয়াদকে চিঠি লিখে জানাতে পারি। আপনিও ইয়াযিদ বা ইবনু যিয়াদকে চিঠি লিখতে পারেন। এর ফলে হয়তো আল্লাহ তাআলা আমার জন্য এমন কোনো পথ খুলে দিতে পারেন-যার কল্যাণে আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বা আপনাকে কষ্ট দেওয়া থেকে বেঁচে যাব।'

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু তার কথাটি আমলে নেন। উজাইব এবং কাদিসিয়ার রাস্তা থেকে বাম দিকে চলতে থাকেন। হুর ইবনু ইয়াযিদও তার বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে তার সাথে চলতে থাকে। [১]

ময়দানে হুসাইনের তৃতীয় ভাষণ

পথিমধ্যে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু আরেকটি ভাষণ দেন। ভাষণের শুরুতে তিনি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করেন। তারপর সবাইকে লক্ষ্য করে বলেন-

'হে লোকসকল, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেউ যদি এমন কোনো শাসককে দেখে-যে হারামকে হালাল মনে করে, ভেঙে ফেলে আল্লাহর সাথে করা অঙ্গীকার, রাসুলের আদর্শের বিরোধিতা করে, আল্লাহর বান্দাদের ওপর জুলুম করে; আর ওই লোকটি তার এসব কাজকর্ম দেখেও কথায় বা কাজে তার বিরোধিতা না করে, তাহলে পরিণতিতে আল্লাহ তাকে সেই জালিম
শাসকের সাথেই জাহান্নামে পৌঁছে দেবেন। [১]

তোমরা ভালো করেই জানো, ইয়াযিদ ও তার অনুসারীরা শয়তানের অনুসরণ করছে, ছেড়ে দিয়েছে আল্লাহর আনুগত্য, পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দিয়েছে, আল্লাহর সীমাকে নাকচ করেছে, রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে বানিয়েছে নিজেদের সম্পত্তি, আল্লাহর হালাল বিধানকে হারাম আর হারামকে বানিয়ে ফেলেছে হালাল।

খিলাফতের বিষয়ে আমি অন্যদের থেকে বেশি হকদার। আমার কাছে পৌঁছেছে তোমাদের অসংখ্য চিঠি। সেসবে ছিল আমার হাতে তোমাদের বাইআত গ্রহণ বিষয়ে আনুগত্যের সংবাদ। অনেক প্রতিনিধিদলও নিয়ে এসেছে সেসব খবর। তারা আরও জানিয়েছে, তোমরা আমাকে ছেড়ে যাবে না। নিজেদের জীবনের মতোই মনে করবে আমার জীবন।

এখন যদি তোমরা তোমাদের বাইআতের ওপর অটল থাকো, তাহলে হিদায়াত পাবে। মনে রেখো, আমি আল্লাহর রাসুলের কলিজার টুকরো ফাতিমার সন্তান। আমার প্রাণ তোমাদের প্রাণের মতোই। আমার পরিবারের মতোই তোমাদের পরিবার। তাই তোমাদের উচিত আমার অনুসরণ করা।

যদি তোমরা এমন না করো-আমার হাতে নেওয়া বাইআতকে ভেঙে দাও, চূর্ণ করে ফেলো আমার সাথে করা অঙ্গীকার, তাহলে তো আমার সাথেও তোমরা তা-ই ঘটাবে-যেমনটা এর আগে আমার পিতা আলি ইবনু আবি তালিব, ভাই হাসান ইবনু আলি ও চাচাতো ভাই মুসলিম ইবনু আকিলের সাথে ঘটিয়েছ।

হায়, সেই লোকটি আসলেই দুর্ভাগা-যে তোমাদের সাথে করা অঙ্গীকারে বিশ্বাস রেখে ধোঁকা খেয়েছে! তোমরাই তোমাদের আখিরাতকে ক্ষতির মুখে ফেলেছ। নিজেদের ওপর জুলুম করেছ। আর যারা বাইআতগ্রহণের পরও ভেঙে ফেলে, তারা তো নিজেদেরই ক্ষতি করে। আল্লাহ তাআলা হয়তো অচিরেই তোমাদের থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী বানিয়ে দেবেন। তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক!'

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর ভাষণ শেষ হয়। তখন হুর ইবনু ইয়াযিদ বলে ওঠে,

'আমি আপনাকে আপনার জীবনের ব্যাপারে আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি। কারণ আমি জানি, আপনি যদি লড়তে আসেন, তাহলে আপনার রক্ত ঝরবে!'

হুসাইন বলেন, 'তুমি কি আমাকে মৃত্যু দিয়ে ভয় দেখাতে চাও? আমি যা বলছি, সেদিকে তোমার তেমন মনোযোগ দেখছি না। তোমার উত্তরে আমি এটুকুই বলতে চাই-যা আল্লাহর রাসুলের সাহায্যে বের হওয়া এক সাহাবি তার ভাইয়ের উপদেশের জবাবে বলেছিলেন।

সেই সাহাবির ভাই বলেছিল, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ? তোমাকে নিশ্চিত হত্যা করে ফেলা হবে।'

উত্তরে তিনি এ কবিতাখানি আবৃত্তি করেছিলেন-

যুদ্ধ করতে যাবই আমি

করি না মৃত্যু-ভয় মুসলিম আমি তাই হৃদয়ে নেই কোনো সংশয়
বাঁচার মতো বাঁচব আমি মরব বীরের মতো, তোদের মতো ঘৃণ্য জীবন নয় কারও কাঙ্ক্ষিত।

হুর ইবনু ইয়াযিদের মনে আগে থেকেই ছিল নবি-পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। এবার এ ভাষণ শুনে সে আরও প্রভাবিত হয়ে পড়ে। হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছ থেকে আলাদা হয়ে পথ চলতে থাকে সে।(আল-কামিল ফিত তারিখ, খন্ড :৩,পৃষ্ঠা :১৫৯)

যুদ্ধের ময়দানে তিরমাহ ইবনু আদি

ঠিক এমন সময় কুফা থেকে চারজন লোককে আসতে দেখা যায়। তারা যুদ্ধের ময়দানে এসে হাজির হয় হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাহায্যকারী হিসেবে। তাদের প্রধান তিরমাহ ইবনু আদি।
কারবালার প্রকৃত ইতিহাস

তিরমাহকে দেখে হুর ইবনু ইয়াযিদ ক্রুদ্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, হয়তো তাকে এখনই বন্দি করে ফেলবে, নয়তো কুফায় ফেরত পাঠিয়ে দেবে।

তখনই হুসাইন ঘোষণা দেন, 'সে আমার সহযোগী ও বন্ধু। আমি তাকে সেভাবেই রক্ষা করব, যেভাবে আমি নিজেকে রক্ষা করি।'
এ কথা শুনে তিরমাহর পথ ছেড়ে দেয় হুর ইবনু ইয়াযিদ।

তার কাছে কুফার পরিস্থিতি জানতে চান হুসাইন। তিরমাহ জানায়, 'কুফায় যত বড় বড় সর্দার ছিল, তাদের সবাইকেই ঘুস দেওয়া হয়েছে। তাদের থলেগুলো মোহরে পরিপূর্ণ। এখন আর তাদের কেউ আপনার পক্ষে নেই। তবে জনতার হৃদয়ে আপনি আছেন। তবুও যখন মুখোমুখি মোকাবেলা হবে, তারাও আপনার বিরুদ্ধে চলে যাবে।'

তিরমাহ ইবনু আদির প্রস্তাব

তিরমাহ ইবনু আদি যখন হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে এসে মিলিত হন, তখন তাকে প্রস্তাব দিয়ে বলেন, 'আল্লাহর রাসুলের দৌহিত্র, আমি দেখছি আপনার সাথে কোনো শক্তিশালী বাহিনী নেই। হুর ইবনু ইয়াযিদের এ বাহিনীও যদি আপনার মোকাবেলা করে, আপনি পরাস্ত হবেন। এদিকে আমি কুফা থেকে বের হওয়ার আগে কুফার সামনে আপনার বিরুদ্ধে সজ্জিত বিশাল এক বাহিনী দেখে এসেছি। এমন বিশাল বাহিনী আমি আমার জীবনে আর দেখেনি।

আল্লাহর শপথ করে বলছি, আপনি আর এক কদমও সামনে বাড়বেন না। আমার সাথে চলুন। আপনাকে আজা পাহাড়ে পৌঁছে দেব। জায়গাটি দুর্গের মতো সুরক্ষিত ও নিরাপদ। গাসসান শাসকগোষ্ঠী, জমির ও লুকমান ইবনু মুনজিরের মোকাবেলায় আমরা এখানেই আশ্রয় নিয়েছিলাম এবং বেঁচেও গিয়েছি।

আপনি সেখানে গিয়ে স্থায়ীভাবে থাকা শুরু করবেন। তারপর একদিন আজা ও সালমা পাহাড়ে বসবাসকারী তাঈ গোত্রকে ডেকে নেবেন। ১০ দিনের মধ্যেই দেখবেন, তাঈয়ের লোকেরা আপনার সাথে পায়ে হেঁটে ও আরোহী হয়ে-দুভাবেই যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত।

তখন যদি আপনি যুদ্ধে আগ্রহী হন, তবে আমি আপনার জন্য ২০ হাজারের একটি বাহিনী সরবরাহ করব। যারা আপনার হয় বীরবিক্রমে লড়াই করবে। আর যতক্ষণ তাদের ভেতর একজনও জীবিত থাকবে, ততক্ষণ শত্রুরা আপনার কাছে ঘেঁষতে পারবে না।'

তার এ প্রস্তাব শুনে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'ভাই আমার, আপান যে প্রস্তাব দিয়েছেন, এর জন্য আল্লাহ তাআলা আপনাকে এবং আপনার গোত্রকে উত্তম বিনিময় দান করুন। কিন্তু আমার আর হুর ইবনু ইয়াযিদের মধ্যে একটি কথা পাকা হয়ে আছে। এখন আমরা সেই কথাটি মেনে চলছি। এ অবস্থায় আপনার সাথে অন্য কোথাও যেতে পারব না। তাছাড়া আমরা জানিও না, আমাদের জন্য সামনে কী অপেক্ষা করছে!'

এরপর তিরমাহ ইবনু আদি চলে যাওয়ার অনুমতি চান। রসদপত্র নিয়ে আবারও আসার আশ্বাস দিয়ে বিদায় নেন তিনি। এমনকি এরপরে দ্বিতীয়বার আসার জন্য বেরও হন। কিন্তু পথিমধ্যে হুসাইনের শাহাদাতের মিথ্যা সংবাদ শুনে ফিরে যান।[আল-কামিল ফিত তারিখ,খন্ড:৩ পৃষ্ঠা :১৬০-১৬১]

হুসাইনের স্বপ্নে মৃত্যুর দেখা

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সঙ্গীদের নিয়ে পথ চলতে থাকেন। চলতে চলতে পৌঁছে যান কাসরে বনি মুকাতিল পর্যন্ত। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য যাত্রাবিরতি করেন এখানে। পথের ক্লান্তিতে তখনই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন তিনি।

হঠাৎই হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়তে পড়তে জেগে ওঠেন। এটা শুনে ফেলেন তার ছেলে আলি আকবর। ভয় পেয়ে যান তিনি। সঙ্গে সঙ্গে পিতার কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন, 'কী হয়েছে বাবা?'

হুসাইন বলেন, 'মাত্রই সুপ্নে দেখেছি, এক অশ্বারোহী আমার কাছে এসেছে। সে বলছে, আমি কিছু লোককে পথ চলতে দেখলাম, যেখানে মৃত্যুও চলছে তাদের পেছন পেছন।'

একটু থেমে হুসাইন বলেন, 'তার এ কথা থেকে আমি বুঝতে পেরেছি, এটা আমাদেরই মৃত্যুর সংবাদ!'

আলি আকবরের ঈমানি দৃঢ়তা

পিতার মুখ থেকে এমন কথা শুনে আলি আকবর জিজ্ঞেস করেন, 'বাবা, আমরা কি সত্যের ওপর নেই?'

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'সেই রবের শপথ, যার কাছে সকলকে ফিরে যেতে হবে- অবশ্যই আমরা সত্যের ওপর আছি!'

এবার আলি আকবর বলে ওঠেন, 'আমাদের মৃত্যু যখন সত্যের ওপরই হচ্ছে, তাহলে আর ভয় কীসের!'

ছেলের কণ্ঠে এমন সাহসী উক্তি শুনে ভীষণ খুশি হন হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু। ছেলেকে বাহবা দিয়ে বলেন, 'আল্লাহ তাআলা তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন! তুমি তোমার পিতার হক সঠিকভাবে আদায় করেছ।'

এরপর সাথিদের নিয়ে আবারও চলতে শুরু করেন হুসাইন। চলতে চলতে নিনওয়া নামক স্থানে এসে পৌঁছান। তখনই দেখতে পান, এক অশ্বারোহী কুফার দিক থেকে আসছে। সবাই তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে যায়।

লোকটি এসে হুর ইবনু ইয়াযিদকে সালাম করে। কিন্তু হুসাইনকে সালাম করেনি। তারপর জ্বরের হাতে ইবনু যিয়াদের একটি চিঠি তুলে দেয়। চিঠিতে লেখা-

'আমার চিঠি তোমার হাতে পৌঁছামাত্রই হুসাইনকে অবরুদ্ধ করে ফেলবে। তাকে খোলা প্রান্তর ছাড়া অন্য কোথাও আশ্রয় নিতে দেবে না। এমন প্রান্তরে তাদের অবরুদ্ধ করবে, যেখানে তারা পানিও না পায়। আর আমি দূতকে বলে দিয়েছি, যতক্ষণ না তুমি আমার আদেশ পালন করছ, সে তোমাদের থেকে আলাদা হবে না।'

হুর ইবনু ইয়াযিদ চিঠিটি পড়ে শোনায় হুসাইনকে। তারপর এই বলে অপারগতা প্রকাশ করে, 'এখন আমার আর কিছুই করার নেই। আমি নিরুপায়। আমার পেছনে ইবনু যিয়াদের

গোয়েন্দা। তাই আপাতত আপনার সাথে কোনো সমঝোতা করতে পারছি না।' [তারিখুত তাবারি,খন্ড:৫,পৃষ্ঠা :৪০৭-৪০৮]

আমি যুদ্ধ শুরুর পক্ষে নই

এ পরিস্থিতি দেখে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু একটু চিন্তিত হয়ে পড়েন। তখন তার সাথিদের একজন যুহাইর ইবনুল কাইন বলেন, 'আপনি তো দেখছেন, কীভাবে কঠিন হয়ে উঠছে আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত। এভাবে বিপদের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেয়ে যারা সামনে আছে, তাদের মোকাবেলা করাটাই ভালো মনে করছি।'

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি আগ বেড়ে যুদ্ধ শুরু করতে চাই না।'

যুহাইর বলেন, 'আপনি যদি যুদ্ধে জড়াতে না চান, তাহলে আমাদের অন্তত ওই বসতিতে নিয়ে চলুন-যেখানে আমরা কিছুটা হলেও নিরাপদ থাকব। ফুরাত নদীও কাছে হবে তখন। সেসময় যদি তারা আমাদের সেখানে যেতে বাধা দেয়, তাহলে আমরা ঠিকই যুদ্ধ করব।'

'সেটা কোন বসতি?' জিজ্ঞেস করেন হুসাইন।

উত্তর আসে, 'জায়গাটির নাম-আকর।'

হুসাইন বলেন, 'এমন নামের বসতি থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আকর শব্দের অর্থই হচ্ছে ধ্বংস!'[তারিখুল তাবারি, খন্ড :৫, পৃষ্ঠা :৪০৯;আল-কামিল ফিত তারিখ, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা :১৬২]

উমার ইবনু সাদের আগমন

তারা তখনো আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত। এমন সময় হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে ইবনু যিয়াদ আরেকটি বাহিনী পাঠায়। এ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ৪ হাজার। তাদের প্রধান উমার ইবনু সাদ। এ বিশাল বাহিনী এসে হুসাইন ও তার সাথিদের পথ আটকে দাঁড়ায়।

উমার ইবনু সাদ সবসময় চেয়েছে, তাকে যেন হুসাইনের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধে জড়াতে না হয়। কিন্তু ইবনু যিয়াদ যেমন কঠোর, তেমনই নাছোড়। তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে যুদ্ধে পাঠায়।

উমার ইবনু সাদ এখানে এসে হুসাইনের মুখোমুখি হয়। তার কাছে কুফায় আসার কারণ জানতে চায়।

হুসাইন বলেন, 'আমাকে কুফাবাসী আমন্ত্রণ জানিয়েছে, তাই এখানে এসেছি। যদি তারা এখন মত বদল করে, আমাকে না চায়, আমি ফিরে যেতে প্রস্তুত।'

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ কথা শুনে ইবনু যিয়াদের কাছে চিঠি লিখে উমার ইবনু সাদ। তাকে জানায়, 'হুসাইন তার সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে যেতে প্রস্তুত।'

হুসাইন যেন পানি না পায়

জবাবি চিঠি চলে আসে ইবনু যিয়াদের কাছ থেকে। সেখানে সে লিখে-
'হুসাইনের সামনে কেবল একটি বিষয়ই পেশ করো। তাকে জিজ্ঞেস করো, সে ইয়াযিদের হাতে বাইআত হতে রাজি আছে কি না। যদি রাজি হয়, তাহলে তো ঝামেলা মিটেই গেল। তখন আমরা ভাবব, তাকে নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।'

সেইসাথে উমারকে এ নির্দেশ দেয়, 'হুসাইন ও তার সাথিরা যেন কোনোভাবেই পানি না পায়। তাদের পানি নেওয়ার সব পথ একদম বন্ধ করে দাও।'

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের তিন দিন আগের ঘটনা এটি। ইবনু যিয়াদের নির্দেশমতো তখনই পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয় পানি।

একপর্যায়ে পরিস্থিতি ভীষণ মর্মান্তিক হয়ে ওঠে। প্রচণ্ড পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েন হুসাইন ও তার সাথিরা। তখন বাধ্য হয়ে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু তার ভাই আব্বাস ইবনু আলিকে ৩০ জন অশ্বারোহী আর ৩০ জন পদাতিক সৈন্য দিয়ে বলেন, 'তাদের সাথে নিয়ে যাও আর পানি নিয়ে আসো।'

তার কথামতো আব্বাস ইবনু আলি তাদের নিয়ে পানি আনতে যান। তখন উমার ইবনু সাদের বাহিনীর সাথে লড়াই হয় তাদের। শেষ পর্যন্ত ২০টি মশক ভরে পানি আনতে সক্ষম হন তারা।[১]

মুখোমুখি উমার ও হুসাইন

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু উমার ইবনু সাদকে একটি বার্তা পাঠান। বলেন, 'আজ রাতে আমরা তোমার বাহিনীর সাথে বসতে চাই। আমার যা বলার, তা সবার সামনাসামনি বলব।'

দিনের আলো ফুরিয়ে নেমে আসে রাতের আঁধার। হুসাইনের কথামতো উমার ইবনু সাদ তার বাহিনী নিয়ে তাদের মুখোমুখি হয়।

হুসাইনের তিন প্রস্তাব

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমাদের পক্ষ থেকে তিনটি প্রস্তাব পেশ করছি। তোমরা এর যেকোনো একটি মেনে নাও-

১. আমি যেখান থেকে এসেছি, সেখানেই ফিরে যাব।

২. আমি নিজেই ইয়াযিদের কাছে যাব। তার সাথে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে দ সমস্যার সমাধান করে ফেলব।

৩. আমাকে একটি সাধারণ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা দেখিয়ে দাও; বলে দাও ত সীমানাও। আমি সেখানেই বসবাস করব।'

কিছু ঐতিহাসিক বলেন, হুসাইন রাযিয়াল্লাহ আনহু শেষদুটো প্রস্তাব দেননি। তিনি শুধু প্রথম প্রস্তাবটিই দেন।

হুসাইনের প্রস্তাব পেয়ে উমার ইবনু সাদ তখনই ইবনু যিয়াদের কাছে চিঠি লেখে তাকে জানায়- 'আল্লাহ যুদ্ধের আগুন নিভিয়ে দিয়েছেন। দূর করে দিয়েছেন মুসলিমদের আপাত বিভেদ। হুসাইন আমাদের কাছে তিনটি প্রস্তাব রেখেছেন। এটা নিশ্চিত, এ প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে আপনার ইচ্ছার বাস্তবায়ন হবে। এতে মুসলিম। উম্মাহর জন্যও রয়েছে কল্যাণ ও বিজয়।'

ইবনু যিয়াদের সম্মতি, শিমরের বিরোধিতা

ইবনু যিয়াদের কাছে যখন উমার ইবনু সাদের চিঠি পৌঁছে, তখন সে এ বার্তায় প্রভাবিত হয়ে পড়ে। বলে, 'চিঠিটি এমন এক ব্যক্তির-যে কিনা আমিরের আনুগত্য প্রত্যাশী; সেইসাথে জাতীয় নিরাপত্তার কথাও তার মাথায় রয়েছে। তার প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হলো।'

শিমর ইবনু জিল জাওশান এ কথা শুনেই বলে ওঠে, 'আপনি কি হুসাইনকে সুযোগ দিতে চাইছেন? সে তো এই সুযোগে আরও শক্তি অর্জন করবে। এরপর আবারও আপনাদের বিরুদ্ধেই লড়াই করতে আসবে। আজ যদি সে আপনাদের হাত থেকে একবার ছুটে যেতে পারে, তাহলে তাকে আর কখনোই বাগে আনতে পারবেন না। আমার আশঙ্কা, এখানে উমার ইবন সাদের কোনো গোপন চাল আছে। আমি শুনেছি, তারা পরস্পরে রাতে সাক্ষাৎ করে, কথাবার্তা বলে। আপনি হুসাইনকে আপনার কাছে আসতে বাধ্য করুন। তারপর চাইলে তাকে শাস্তি দেবেন, নয়তো ক্ষমা করে দেবেন।'

ইবন যিয়াদ তা-ই করে। শিমরের কথামতো হুসাইনকে নিয়ে আসতে চিঠি পাঠায় উমার ইবনু সাদের কাছে।

চিঠিটি ইবনু সাদ পর্যন্ত নিয়ে যায় শিমর নিজেই। তাকে এ নির্দেশ দেয় ইবন যিয়াদ। সেইসাথে এটাও বলে দেয়, 'যদি উমার ইবনু সাদ আমার নির্দেশ তখনই বাস্তবায়ন না করে, তাহলে তাকে সেখানেই হত্যা করবে। এরপর তুমিই হবে সেই বাহিনীর প্রধান। '(আল-কামিল ফিত তারিখ, খন্ড:৩,পৃষ্ঠা :১৬৪-১৬৬)

উমারকে ইবনু যিয়াদের চিঠি

ইবনু যিয়াদ উমার ইবনু সাদকে যে চিঠি দেয়, তার ভাষ্য ছিল এমন-

'ইবনু সাদ, ভালো করে শুনে রাখো-আমি তোমাকে যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে, শত্রুকে সুযোগ দিতে বা তার জন্য সুপারিশ করতে পাঠাইনি। যদি হুসাইন ও তার সাথিরা আমার প্রস্তাবে সম্মত হয়ে আমার কাছে আসতে চায়, তাহলে তাদের ঠিকঠাক আমার কাছে পৌঁছে দাও। যদি তারা এটা না মানে, তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করো। একদম নিঃশেষ করে দাও তাদেরকে। এরই উপযুক্ত তারা। হত্যার পর তাদের লাশগুলোকে ঘোড়ার খুরের নিচে পিষে ফেলবে। যদি তুমি আমার এ নির্দেশ পালন করো, আনুগত্যশীল লোকদের মতোই পুরস্কার পাবে। আর যদি পালন না করো, তবে শিমরকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে আমার বাহিনী ছেড়ে চলে যাও।'

ইবনু যিয়াদের এ নির্দেশ ও চিঠি নিয়ে শিমর রওনা হতে প্রস্তুত হয়। হঠাৎ তার মনে পড়ে, হুসাইনের বাহিনীতে তার ফুপাতো ভাইয়েরা আছে। আব্বাস, আব্দুল্লাহ, জাফর, উসমান-এদের কি হবে?

দেরি না করে তখনই সে ইবনু যিয়াদের কাছে যায়। তার কাছ থেকে তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি পাশ করিয়ে নেয়। তারপর রওনা হয়।

নিরাপত্তাপত্রটি একজন দূতকে দিয়ে আগেভাগে পাঠিয়ে দেয় শিমর। দূত এটি তার ভাইদের হাতে পৌঁছে দেয়। তারা এটি পড়ে সমস্বরে বলে ওঠে, 'আফসোস! আমাদের মতো নগণ্যদের নিরাপত্তা দেওয়া হয়, কিন্তু আল্লাহর রাসুলের দৌহিত্র হুসাইনের কোনো নিরাপত্তা নেই! শিমর, তোমার নিরাপত্তার দরকার নেই আমাদের। আল্লাহর নিরাপত্তাই সবচেয়ে উত্তম। লানত তোমার ওপর এবং তোমার দেওয়া নিরাপত্তার ওপর!'

শিমর এসে উমার ইবনু সাদের কাছে সেই নির্দেশ ও চিঠি পৌঁছে দেয়। তা দেখে উমার বুঝতে পারে, শিমরই ইবনু যিয়াদকে প্ররোচিত করে এই চিঠি লিখিয়ে নিয়েছে। তার কথায় প্রভাবিত হয়েই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইবনু যিয়াদ।

উমার ইবনু সাদ শিমরকে বলে, 'তুমি এক পাপিষ্ঠ। আমাদের কাঁধে অনেক বড় দায়ী চাপিয়েছ তুমি। মুসলিমরা একতাবদ্ধ হতে যাচ্ছিল; তুমিই তাতে ফাটল ধরিয়েছ খুলে দিয়েছ রক্তারক্তির পথ।'

তারপর হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ইবনু যিয়াদের বার্তা পাঠানো হয়। তিনি তখনই এটা নাকচ করে দেন। বলেন, 'ইবনু যিয়াদের এ নির্দেশ মানার চেয়ে লড়াই করে মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়াই ভালো!' [তারিখুল তাবারি,খন্ড :৫,পৃষ্ঠা:৪১৫]

হুসাইনের স্বপ্নে নবিজি

দিনটি ছিল মুহাররম মাসের ৯ তারিখ। শিমর ময়দানে হাজির হয়। হুসাইন রাযিয়াল্লাহ আনহু তখন তাঁবুর সামনে বসা। এ অবস্থায় তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। হঠাৎই জোরে শব্দ করে জাগ্রত হয়ে যান।

আওয়াজ শুনে দৌড়ে আসেন বোন যাইনাব রাযিয়াল্লাহু আনহা। চিৎকারের কারণ জিজ্ঞেস করেন।

হুসাইন বলেন, 'এইমাত্র আমি নানাজান আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি আমাকে বলেছেন, হুসাইন, খুব দ্রুতই তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে।'

এটুকু শুনেই আকুল হয়ে কাঁদতে শুরু করেন বোন যাইনাব। হুসাইন রাযিয়াল্লাহ আনহু তাকে সান্ত্বনা দেন। (আল-কামিল ফিত তারিখ, খন্ড:৩,পৃষ্ঠা :১৬৫)

তখনই দেখা যায় শিমরের বাহিনীকে। তারা এসে হুসাইনের সামনে উপস্থিত হয়। আব্বাস ইবনু আলি তাদের মোকাবেলায় এগিয়ে যান। তার সাথে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক কথাবার্তা বলে। তখনই শিমর যুদ্ধের ঘোষণা দেয়।

আব্বাস চলে আসেন হুসাইনের কাছে। এ খবর তাকে জানান।
লিখিয়ে

বড় দায় রিয়েছ।

পরিবারের সামনে হুসাইনের ভাষণ

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু নবি-পরিবারের সদস্য এবং তার সাথিদের জড়ো করেন।

তাদের সামনে একটি ভাষণ দেন। সেই ভাষণে তিনি বলেন, 'সুখে-দুঃখে সব অবস্থায় আমি মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। হে আল্লাহ, আমি আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি- আপনি আমাদের নবি-পরিবারের সদস্য বানিয়ে সম্মানিত করেছেন। আপনি আমাদের দিয়েছেন চোখ, কান ও হৃদয়; যার কল্যাণে আমরা আপনার বাণী ও নিদর্শন বুঝতে পারি। আমাদের কুরআন শিখিয়েছেন; দান করেছেন দ্বীনের জ্ঞান। এখন আপনি আমাদের আপনার কৃতজ্ঞ বান্দাদের দলভুক্ত করে নিন!'

এরপর একটু থেমে বলেন, 'এ মুহূর্তে আমি আমার সাথিদের মতো সৎ ও বিশ্বস্ত আর কাউকে দেখছি না। আমার পরিবারের সদস্যদের মতো দৃঢ় ও আস্থাশীল আর কারও পরিবার নেই। আল্লাহ তাআলা আমার পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন! আমি বুঝতে পারছি, আগামীকাল হবে আমাদের শেষ দিন। তাই আমি তোমাদের সবাইকে অনুমতি দিচ্ছি, পারলে রাতের আঁধারেই কোথাও গিয়ে আত্মগোপন করো; নিজেদের রক্ষা করো। আমার পরিবারের সদস্যদেরও একেকজন করে নিয়ে যাও। যে যেদিকে পারো ছড়িয়ে পড়ো। কারণ শত্রুদের দরকার আমাকে। আমাকে পেয়ে গেলে তাদের আর কাউকে নিয়ে মাথাব্যথা নেই।'

এ ভাষণ শুনে তার ভাইয়েরা, ছেলেরা, ভাইদের ছেলেরা, আব্দুল্লাহ ইবনু জাফরের ছেলেরা- সবাই একসাথে বলে ওঠেন, 'এমনটি কখনোই হতে পারে না। আপনি যদি না থাকেন, তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরও জীবিত না রাখুন!'

তারপর হুসাইন বনু আকিলকে লক্ষ্য করে বলেন, 'মুসলিম ইবনু আকিল তোমাদেরই একজন। সে শহিদ হয়ে গেছে। কুরবানির জন্য এটুকুই যথেষ্ট। তোমরা সবাই ফিরে যাও। আমি খুশি মনে তোমাদের অনুমতি দিচ্ছি।'

তারা জবাব দেয়, 'এরকম হলে আমাদের দেখানোর মতো মুখ থাকবে না। আমর কী বলব লোকদের? বড়দের বিপদের মুখে রেখে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেছি? আল্লাহর শপথ, আমরা মোটেই এমনটি করব না। বরং আমাদের জানমাল ও সন্তানাদি সব আপনার জন্য বিলিয়ে দেব!' তারপর মুসলিম ইবনু আওসাজা একটি উদ্দীপ্ত ভাষণ দেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসুলের দৌহিত্র, যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ আছে, আমি আপনার হয়ে লড়ব। আপনার সামনেই লড়াই

করতে করতে শহিদ হয়ে যাব!'(তারিখুত তাবারি, খন্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৪১৮-৪১৯; আল-কামিল ফিত তারিখ, খন্ড:৩,পৃষ্ঠা :১৬৬-১৬৭)

ফজরের সালাতের পরপরই উমার ইবনু সাদ তার বাহিনী নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে সৈন্য ছিল সাকুল্যে ৭২ জন। ৩২ জন অশ্বারোহী আর ৪০ জন পদাতিক। তিনিও তাদের মোকাবেলার জন্য দাঁড়িয়ে যান। নিজের সাথিদের সারিবদ্ধ করেন।(আল-কামিল ফিত তারিখ, খন্ড:৩,পৃষ্ঠা:১৬৮;তারিখুল তাবারি, খন্ড:৫, পৃষ্ঠা:৪২১-৪২২)

হুসাইনের সঙ্গী হুর ইবনু ইয়াযিদ

উমার ইবন সাদ তার বাহিনীকে চারটি দলে ভাগ করে। একেক ভাগের জন্য নিয়োগ করে পৃথক পৃথক সেনাপতি। এরই এক ভাগের সেনাপতি হয় হুর ইবন ইয়াযিদ। তাকে সবার আগে ১ হাজার সেনাবাহিনী দিয়ে যুদ্ধের জন্য পাঠানো হয়েছিল।

হুর ইবনু ইয়াযিদের বাহিনী হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনী থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে পথ চলছিল। নবিপরিবারের প্রতি তার অনুরাগ ছিল আগে থেকেই। হুসাইনি কাফেলাকে কাছ থেকে দেখে সে অনুরাগ গভীর ভালোবাসায় বদলাতে সময় লাগেনি। সে তার বিগত দিনের কার্যকলাপের জন্য অনুতপ্ত হয়। এরপর ছুটে যায় হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে।

হুর হুসাইনকে বলে, 'শুরুর দিকে আমার উদাসীনতা আর আপনাকে ফিরে যাওয়ার পথ না দেখানোর ফল এখন সামনেই। আমি আসলেই বুঝতে পারিনি, অবস্থা ঠিক এভাবে মোড় নেবে; তারা আপনার বিরুদ্ধে গিয়ে এতটা শক্ত অবস্থান গড়ে তুলবে। এমনকি আপনার কোনো কথাই শুনবে না। যদি আমি ঘুণাক্ষরেও এরকম কিছু বুঝতে পারতাম, আপনার পথ আটকাতাম না। এখন আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। তাই তাওবা করে ফিরে এসেছি আপনার কাছে। এখন আমার শাস্তি একটাই-আপনার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে যাব আর এভাবেই শহিদ হয়ে যাব।'

হুর ইবনু ইয়াযিদ তার কথার সত্যতা প্রমাণ করেন। সেই যুদ্ধে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ হয়ে তিনি প্রাণপণ লড়াই করে যান। তারপর শাহাদাতের ভাগ্যবরণ করে নিজেকে সৌভাগ্যবানদের কাতারে শামিল করেন।[আল-কামিল ফিত তারিখ, খন্ড :৩,পৃষ্ঠা :১৭১;তারিখুল তাবারি, খন্ড :৫, পৃষ্ঠা :৪২৭-৪২৮]

দুই বাহিনীকে হুসাইনের সম্ভাষণ

মুখোমুখি দুই বাহিনী। হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সামনে এগিয়ে যান। সকলকে লক্ষ্য করে বলেন-

'হে লোকসকল, তোমরা আমার কথাগুলো শোনো। তাড়াহুড়ো করো না। আমাকে সুযোগ দাও, আমি যেন তোমাদের কিছু উপদেশ দিতে পারি। যেন তোমাদের সামনে আমার এখানে আসার কারণটা স্পষ্ট করতে পারি

তোমরা যদি আমার অপারগতা মেনে নাও, আমার কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, আমার প্রতি করো ন্যায়বিচার-তাহলে এতেই তোমাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ ও সৌভাগ্য। আমাকে হত্যার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে এমনিতেই। আর যদি তোমরা আমার অপারগতা মেনে না নাও, বিশ্বাস না করো আমার কথার সত্যতা-তাহলে তোমরা সকলে মিলে তোমাদের করণীয় নির্ধারণ করো। ডেকে নাও তোমাদের সুহৃদ ও সমর্থকদের। পরে যেন তোমাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত তোমাদেরই উদ্বেগের কারণ না হয়। এরপর আমার ওপর সেটা (তোমাদের সিদ্ধান্ত) প্রয়োগ করো। এ ব্যাপারে আমাকে সুযোগ দিয়ো না। নিশ্চয় আমার সাহায্যকারী সেই মহান আল্লাহ, যিনি কিতাব নাযিল করেছেন। আর তিনি পুণ্যবানদের সাহায্য করেন।'

হুসাইনের হৃদয় তড়পানো ভাষণ

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু শত্রুপক্ষের দিকে চোখ ফেরান। তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। সবাই তখন নীরব; নারীদের আহাজারিও থেমে গেছে। সেসময় তিনি হৃদয় তড়পানো একটি ভাষণ দেন।

আল্লাহ তাআলার প্রশংসা জ্ঞাপন এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ প্রেরণ করে বলেন-

'হে লোকসকল, তোমরা আমার বংশধারা খেয়াল করে দেখো-আমি কে? তারপর গভীরভাবে চিন্তা করো, আমাকে যে হত্যা করতে চাইছ; আঘাত করতে চাইছ আমার সম্মানের ওপর-এটা তোমাদের জন্য বৈধ কি না?

আমি কি তোমাদের নবি-কন্যার পুত্র নই? আমি কি সেই ব্যক্তির সন্তান নই-যিনি ছিলেন নবির চাচাতো ভাই ও পরামর্শকা। এবং মুমিনদের ভেতরও উত্তম? শহিদদের নেতা হামযা কি আমার পিতার চাচা ছিলেন না? জাফর ইবনু আবি তালিব কি আমার চাচা ছিলেন না?

তোমাদের কি সেই প্রসিদ্ধ হাদিসটি মনে নেই-যেখানে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ও ভাই হাসানকে জান্নাতি যুবকদের নেতা আখ্যা দিয়েছেন? [মুসনাদে আহমাদ:১০৯৯৯;সুনানুত তিরমিযি:৩৭৬৮]

যদি তোমরা আমার বক্তব্যকে সত্য জেনে থাকো-আর আল্লাহর কসম, আমি এক বিন্দুও মিথ্যা বলছি না। যেদিন থেকে আমি জেনেছি, মিথ্যা বললে আল্লাহ অখুশি হন; তারপর থেকে জীবনে কখনো মিথ্যা বলিনি। তবুও যদি আমার কথা তোমাদের বিশ্বাস না হয়, তাহলে তোমাদের ভেতরেই এমন লোক আছেন, যারা একে সত্যায়ন করতে পারেন।

তোমরা এ ব্যাপারে জাবির ইবনু আব্দিল্লাহকে জিজ্ঞেস করো। আবু সাইদ অথবা সাহল ইবনু সাদ থেকে জেনে নাও। যাইদ ইবনু আরকাম কিংবা আনাস ইবনু মালিককেও জিজ্ঞেস করতে পারো। তারাই তোমাদের বলে দেবেন-তারা নিশ্চিতভাবে আল্লাহর রাসুলকে এ কথা বলতে শুনেছেন।

তবে কি এটাও তোমাদের হাতে আমার নিহত হওয়া থেকে বাধা দিতে অক্ষম?

তোমরা আমাকে বলো, আমি কি কাউকে হত্যা করেছি; যার মুক্তিপণ হিসেবে তোমরা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছ? আমি কি কারও সম্পদ লুট করেছি। আঘাত করেছি কাউকে?'

এরপর হুসাইন কুফার নেতাদের নাম ধরে ধরে ডাকতে থাকেন, 'হে শাবাস ইবনু রিবয়ি, হাজ্জার ইবনু আবজার, কাইস ইবনুল আশআস, যাইদ ইবনুল হারিস-তোমরা কি কুফা থেকে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি লেখোনি?'

তারা সবাই অস্বীকার করে বলে ওঠে, 'না, আমরা লিখিনি।'

হুসাইন বলেন, 'তোমরা যতই অস্বীকার করো না কেন, আমার কাছে তোমাদের পাঠানো চিঠির প্রমাণ রয়েছে।'

তারপর বলেন, 'হে লোকসকল, তোমরা যদি আমার এ আগমনকে অপছন্দ করে থাকো, তাহলে আমাকে এমন কোথাও চলে যাওয়ার সুযোগ দাও-যেখানে গেলে আমি নিরাপদ।'

এ কথায় কাইস ইবনুল আশআস বলে, 'আপনি আপনার চাচাতো ভাই ইবনু যিয়াদের কাছে নিজেকে সমর্পণ করছেন না কেন? তিনি তো আপনার ভাই। আপনার সাথে কোনোরকম অন্যায় আচরণ করবেন না।'

হুসাইন তাকে উত্তর দেন, 'মুসলিম ইবনু আকিলকে হত্যা করার পরও তোমরা এ কথা বলো? আল্লাহর কসম, আমি কখনোই তার কাছে আত্মসমর্পণ করব না।'

এ কথা বলেই ঘোড়া থেকে নেমে যান হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু।

তারপর যুহাইর ইবনুল কাইন দাঁড়িয়ে যান। যুদ্ধোন্মুখ লোকদের লক্ষ্য করে বলেন, 'হে লোকসকল, নবি-পরিবারের সদস্যদের হত্যার পরিকল্পনা থেকে তোমরা সরে এসো! যদি তোমরা এ পদক্ষেপ থেকে পিছিয়ে না আসো, ইবন যিয়াদের সঙ্গা দাও; তবে জেনে রেখো, ইবন যিয়াদের হাত ধরেও তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে না। সে তোমাদেরকেও অপমান এবং হত্যা করবে।'

এ কথা শুনে উদ্ধত লোকগুলো যুহাইরের দিকে তেড়ে আসে, তাকে গালমন্দ করতে থাকে। প্রশংসা করে ইবন যিয়াদের। তারপর বলে, 'আমরা তোমাদের সবাইকে হত্যা করে ইবনু যিয়াদের কাছে পাঠাব।'
যুহাইর বলেন, 'জালিমরা, এখনো সময় আছে হুঁশে ফেরো। ফাতিমার সন্তান হুসাইন সুমাইয়ার পুত্র ইবনু যিয়াদ থেকেও সম্মান ও মর্যাদার বেশি হকদার। যদি তোমরা তাকে কোনো সহায়তা না করতে চাও, তাহলে অন্তত তাকে তার চাচাতো ভাই ইয়াযিদের কাছে যেতে দাও। তারা নিজেরাই তাদের ভেতরকার ঝামেলা মিটিয়ে নেবেন। আল্লাহর কসম, এটুকুর জন্য ইয়াযিদ তোমাদের ওপর চটবে না।' [আল-কামিল ফিত তারিখ, খন্ড:৩, পৃষ্ঠা :১৭০-১৭২)

বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা

তাদের এ কথোপকথন দীর্ঘ হতে থাকে। এটা দেখে সহ্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে শিমর ইবন জিল জাওশান। যুহাইরকে লক্ষ্য করে প্রথম তিরটি ছোড়ে সে। ফলে দুই বাহিনীতে বেজে ওঠে যুদ্ধের দামামা।

হুর ইবনু ইয়াযিদ-যিনি ইবনু যিয়াদের বাহিনী ছেড়ে হুসাইনের বাহিনীতে এসে যোগ দিয়েছেন- সামনে এগিয়ে আসেন তিনি। শত্রুপক্ষকে লক্ষ্য করে বলেন-

'হে কুফাবাসী, তোমাদের ধ্বংস হোক! তোমরা কি তাকে এজন্যই ডেকেছিলে-তিনি এলে তাকে হত্যা করবে? তোমরা বলেছিলে, আমরা আপনার জন্য নিজেদের জানমাল সবকিছু বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। আর এখন তোমরাই তাকে হত্যার জন্য উদ্যত হয়ে আছ! এমনকি তাকে আল্লাহর প্রশস্ত জমিনের কোথাও চলে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছ না-যেখানে তিনি ও তার পরিবার নিরাপদ!

তোমরা তার সাথে বন্দিদের মতো আচরণ করছ। তার জন্য নিষিদ্ধ করে রেখেছ কুলকুল করে বয়ে চলা ফুরাতের জলধারা। যে পানি ইহুদি, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজক নির্বিশেষে সবাই পান করতে পারে; শূকরের মতো নিকৃষ্ট প্রাণীও যেখান থেকে স্বাধীনভাবে নিজের পিপাসা মেটাতে পারে- সেই পানি না পেয়ে আল্লাহর রাসুলের দৌহিত্র হুসাইন ও তার পরিবার পিপাসায় কাতর হয়ে আছে!

ভেবে দেখো, তোমরা আল্লাহর রাসুল ও তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি কী ভয়াবহ ও মারাত্মক জুলুম করে যাচ্ছ! তোমরা যদি এখনই এ নিষ্ঠর অমানবিক আচরণ থেকে বিরত না হও, তাওবা না করো, তাহলে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তোমাদেরকেও যেন এমন পিপাসিত রাখেন!'

হুর ইবন ইয়াযিদ তার কথা শেষ করেন। তখনই একটি তির এসে বিদ্ধ হয় তার গায়ে। পিছিয়ে আসেন হুর। হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে যান। সাথে সাথে দুপক্ষ থেকে তির চালাচালি শুরু হয়। শুরু হয় তুমুল লড়াই।

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথিরা একজনের পর একজন শহিদ হতে থাকেন। শত্রুপক্ষেরও অনেকে প্রাণ হারাতে থাকে। হুসাইনের সমরসঙ্গী হয়ে তীব্র লড়াই চালিয়ে যান হুর ইবনু ইয়াযিদ। অনেককেই হত্যা করেন।

হঠাৎ আঘাত পেয়ে লুটিয়ে পড়েন মুসালম ইবনু আওসাজা। তার কাছে এগিয়ে আসেন হাবিব ইবনু মুতাহহির। বলেন, 'জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো মুসলিম। যদি আমার জানা না থাকত, তোমার পরে আমিও শহিদ হতে চলেছি; তবে আমি তোমার থেকে শেষ অসিয়ত জানতে চাইতাম।'

মুসলিম ইবনু আওসাজা বলেন, 'হ্যাঁ, আমি তোমার কাছে একটি অসিয়ত করে যেতে চাই!'

হুসাইনের দিকে ইশারা করে বলেন, 'যতক্ষণ তোমার দেহে প্রাণ থাকে, তাকে আগলে রেখো।'

তখনই চারদিক থেকে হল্লা করে হুসাইন ও তার সাথিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাপিষ্ঠ শিমর ও তার বাহিনী। প্রবল সাহস ও বীরত্বের সাথে তাদের মোকাবেলা করেন হুসাইনের সাথিরা। তারা কুফা বাহিনীর যেদিকেই আক্রমণ করছেন, সেদিকের ময়দান শূন্য হয়ে পড়ছিল।

উরওয়া ইবনু কাইস যখন এ অবস্থা দেখে, তখন উমার ইবনু সাদ থেকে আরও সাহায্য প্রত্যাশা করতে থাকে।

শাবাস ইবনু রিবয়িকে বলে, 'তুমি আগে বাড়ছ না কেন?'

তখন শাবাস বলে ওঠে, 'তোমরা সবাই পথভ্রষ্ট হয়ে গেছ। এসময়ে হুসাইন ইবনু আলিই জমিনের ওপর সবার সেরা। অথচ সুমাইয়ার ছেলে ইবনু যিয়াদের হয়ে তোমরা তার বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছ!'

এদিকে উমার ইবনু সাদ ৫০০ নতুন সৈন্য পাঠায়। তারা এসে লড়াইকে চাঙা করে তোলে। হুসাইনের সাথিরা তাদের সফলভাবে মোকাবেলা করতে থাকেন। ঘোড়া ছেড়ে পদাতিক হয়ে লড়তে থাকেন তারা। হুর হবন ইয়াযিদ তখন প্রচণ্ড আহত। তবুও তিনি প্রাণপণে লড়াই করে চলছেন।
একপর্যায়ে শত্রুবাহিনী আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। হুসাইনের সাথিদের তাঁবুগুলোতে আগুন দেওয়া শুরু করে তারা।[১]

তুমুল যুদ্ধে যুহরের সালাত

ততক্ষণে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর বেশিরভাগ সাথিই শহিদ হয়ে গেছেন। শত্রুবাহিনীও চলে এসেছে তাদের খুব নিকটে।

ঠিক তখনই আবু সুমামা আস-সায়িদি হুসাইনকে লক্ষ্য করে বলেন, 'আপনার ওপর আমার জীবন কুরবান হোক! চাইছিলাম আপনার সামনেই যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়ে যাব। আবার এটাও মন চাইছে-যুহরের সময় যেহেতু হয়ে গেছে, সালাতটা পড়েই রবের সাথে মিলিত হই!'

হুসাইন বজ্রকণ্ঠে বলে ওঠেন, 'যুদ্ধ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখা হোক। আমরা সালাত আদায় করব।'

দুপক্ষ থেকে প্রবল আক্রমণ হচ্ছে। এমন তুমুল যুদ্ধে কে শোনে কার কথা!

তখনই আবু সুমামা শহিদ হয়ে যান। এর কিছুক্ষণ পর হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু তার কিছু সাথিকে নিয়ে সালাতুল খাওফেরা মতো করে যুহরের সালাত আদায় করেন। (আল-কামিল ফিত তারিখ,খন্ড :৩,পৃষ্ঠা :১৭৬-১৭৭)

শহিদি কাফেলার বীর সেনারা

সালাতের পর আবারও শুরু হয় যুদ্ধ। হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর একদম দোরগোড়ায় পৌঁছে যায় শত্রুবাহিনী। অবস্থা বেগতিক দেখে হুসাইনের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে যান সাইদ ইবনু আব্দিল্লাহ আল-হানাফি। তিরগুলো এসে তার বুক ঝাঁঝরা করে দেয়। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে ঢলে পড়েন মাটিতে।
এসময়ে যুহাইর ইবনুল কাইনও হুসাইনের পক্ষ হয়ে তুমুল লড়াই করেন। শিমরের তিরের আঘাতে তিনি আগে থেকেই আহত। তাই শত্রবাহিনীর তীব্র হামলা বেশিক্ষণ প্রতিরোধ করতে পারেননি।

তখন হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর পাশে কয়েকজন সাথি ছাড়া আর কেউ জীবিত ছিল না। তার সাথিরাও অবস্থা দেখে পরিণতি বুঝে গিয়েছিল-না তারা হুসাইনকে বাঁচাতে পারবে, আর না নিজেদের।

তখন তাদের সবার কেবল একটাই চাওয়া-আমিই সবার আগে হুসাইনের সামনে লড়াই করতে করতে প্রাণ বিলিয়ে দেব। এজন্য তখন সবাই অসীম বীরত্বের সাথে মরণপণ লড়াই করতে থাকেন।

ঠিক তখনই হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর বড় ছেলে আলি আকবর এ কবিতাটি পড়তে পড়তে সামনে এগিয়ে যান-

আমি আলির ছেলে হুসাইনের পুত্রধন আমরাই রাসুলের সবচেয়ে প্রিয়জন!

এসময়ে আলি আকবরকে লক্ষ্য করে বল্লম ছুড়ে মারে মুররাহ ইবনু মুনকিজ। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন আলি আকবর। এরপর কয়েকটা ঘাতক এগিয়ে এসে তারবারির আঘাতে টুকরো টুকরো করে ফেলে তার দেহ।

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু সেদিকে এগিয়ে যান। ছেলের খন্ডিত লাশ সামনে নিয়ে বলেন, 'আল্লাহ তাআলা তাদের ধ্বংস করুন-যারা তোমাকে এভাবে শহিদ করেছে। ওরা আল্লাহর পদক্ষেপের ব্যাপারে কতই না অজ্ঞ! তোমার শাহাদাতের পর আমার আর বেঁচে থাকার কোনো অর্থ নেই!'

আলি আকবরের লাশ উঠিয়ে তাঁবুর দিকে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রবল বীরত্বের সাথে শত্রুবাহিনীর মোকাবেলা করতে থাকেন কাসিম ইবনু হাসান। তখনই তার মাথা লক্ষ্য করে তরবারি চালায় আমর ইবনু সাদ ইবনি নুফাইল। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন বীর কাসিম।

তার মুখ থেকে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হয়- 'চাচাজান!'

আওয়াজ পেয়েই হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু দৌড়ে এসে তাকে ধরেন। পালটা হামলা করেন আমর ইবনু সাদের ওপর। কনুই থেকে তার হাত কেটে যায়।
কাঁধে করে ভাতিজা কাসিমের লাশ বয়ে আনেন হুসাইন। নিজের ছেলে ও পরিবারের অপরাপর শহিদদের কাতারে শুইয়ে দেন তাকে।

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু একদম একাকী হয়ে পড়েন। কিন্তু তার দিকে এগোতে সাহস পায় না কেউ। এভাবেই কেটে যায় অনেকটা সময়। কেউ একটু এগোলে আবারও পিছিয়ে যায় পরক্ষণেই। হুসাইনকে হত্যার দায় ও পাপ কোনোটাই নিতে চাইছে না কেউ।

একপর্যায়ে কুফার কিন্দা গোত্রের মালিক ইবনু নুসাইর নামক এক ব্যক্তি এগিয়ে আসে। হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর মাথা লক্ষ্য করে তরবারি দিয়ে আঘাত করে এ পাপিষ্ঠ। এতে গুরুতর আহন হন হুসাইন।

ছোট ছেলে আব্দুল্লাহকে ডেকে কোলে এনে বসান। বনু আসাদের আরেক পাপিষ্ঠ তির ছুড়ে তাকেও শেষ করে দেয়। ছোট ছেলের রক্তে রঞ্জিত হয়ে জমিনে গড়িয়ে পড়েন হুসাইন। সকাতর মিনতি জানান মহান রবের দরবারে- 'হে আল্লাহ, আপনি এই জালিমদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিশোধ নিন!'

এসময়ে প্রচণ্ড পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েন হুসাইন। একটু পানিপানের জন্য ফুরাতের দিকে এগিয়ে যান। তখনই পাষণ্ড হুসাইন ইবনু তামিম তার মুখ লক্ষ্য করে তির ছোড়ে। তিরটি লাগতেই মুখ থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসে রক্তের নহর।

ঝরে গেল জান্নাতি ফুল

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন আহত সিংহের মতো পড়ে আছেন। এমন সময় ১০ জন সৈন্য নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসে শিমর। আঘাতে জর্জরিত আর পিপাসায় কাতর হয়েও তাদের সাথে অসীম বীরত দেখান হুসাইন। তিনি যেদিকেই এগিয়ে যান, শত্রুরা পিছিয়ে যেতে থাকে।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, এটি ছিল এক অনন্য ঘটনা; যার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার। যে ব্যক্তির কলিজার টুকরো সন্তান-সহ গোটা পরিবারকে প্রায় শেষ করে দেওয়া
হয়েছে, তার ওপরে তাকেও আঘাতে আঘাতে করা হয়েছে জর্জরিত; এমনকি একফোঁটা পানি থেকে রাখা হয়েছে বঞ্চিত, সেই চরম সঙিন মুহূর্তেও ভিড় শত্রুদের সাথে প্রচণ্ড সাহস ও মনোবল নিয়ে লড়াই করে যান। তিনি যেদিকে এগিয়ে যান, শত্রুরা ভেড়ার পালের মতো পালিয়ে যেতে থাকে।

শিমর যখন বুঝতে পারে, হুসাইনকে হত্যা থেকে সবাই নিজেকে বাঁচিয়ে চলছে, তখন সে হুংকার দিয়ে বলে, 'তোমরা একসাথে হামলে পড়ো তার ওপর!

সাথে সাথে কতগুলো পাপিষ্ঠ আগ বেড়ে তির-তরবারি-বল্লম নিয়ে হামলে পড়ে হুসাইনের ওপর। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর রাসুলের দৌহিত্র, তার কলিজার টুকরো, জান্নাতি যুবকদের নেতামিম হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু শত্রুপক্ষের সাথে বীরের মতো লড়াই করতে করতে শহিদ হয়ে যান। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

কেটে ফেলল মাথা

শাহাদাতের ভাগ্য বরণ করে নিয়েছেন হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু। ধুলোতে পড়ে আছে তার নিথর শরীর। তবুও যেন পাপিষ্ঠগুলোর মনের খেদ মেটেনি। খাওলি ইবনু ইয়াযিদকে লক্ষ্য করে শিমর বলে, 'তার মাথা কেটে ফেলো।'

ইবনু ইয়াযিদ আগে বাড়ে ঠিকই, কিন্তু কেঁপে ওঠে তার হাত। তখনই সিনান ইবনু আনাস নামক নিকৃষ্ট ও পাপিষ্ঠ এ কাজটা করে।

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর শরীরে তখন ৩৩টি বল্লম ও ৩৪টি তরবারির আঘাত ছিল। আর তিরের আঘাত ছিল অসংখ্য। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। আমাদেরকে দান করুন তার এবং তার সম্মানিত পিতার প্রতি ভালোবাসা।

হুসাইন ও নবি-পরিবারের বাকি সদস্যদের শহিদ করে শিমর এবার আলি আসগর যাইনুল আবিদিনের দিকে এগিয়ে যায়। তাকেও হত্যা করতে চায় এই পাপিষ্ঠ।

তখন হুমাইদ ইবনু মুসলিম বলে ওঠে, 'তুমি কি এই অসুস্থ শিশুটিকেও ছাড়বে না? তাকেও হত্যা করতে চাইছ?'
হুমাইদের কথায় তাকে ছেড়ে দেয় শিমর।

উমার ইবনু সাদ আগ বেড়ে নারী-তাঁবুর দিকে ইশারা করে বলে, 'এ তাঁবুর কাছেও যাবে না কেউ। আর এই অসুস্থ শিশুর দিকেও হাত বাড়াবে না।' (আল-কামিল ফিত তারিখ, খন্ড:৩,পৃষ্ঠা:১৮৩-১৮৪)

লাশের সাথে শত্রুতা

ইবনু যিয়াদের আদেশ ছিল, হুসাইনকে হত্যার পর তার মৃতদেহ ঘোড়ার খুরের সাথে বেঁধে দেবে। তারপর মাটিতে পিষ্ট করবে।

উমার ইবনু সাদের নির্দেশে কয়েকটা পাপিষ্ঠ এ জঘন্য কাজটা করতেও পিছপা হয়নি।[তারিখুল তাবারি, খন্ড:৫, পৃষ্ঠা:৪৫৪-৪৫৫]

যত প্রাণ হলো কুরবান

এক বিয়োগান্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে শেষ হয় পৃথিবীর সবচেয়ে বর্বরোচিত যুদ্ধটি। দুই বাহিনীর হতাহত ও শহিদদের সংখ্যা গণনা করতে গিয়ে দেখা যায়, হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীর ৭২ জন শহিদ হন। অপরদিকে উমার ইবনু সাদের বাহিনীর নিহত সৈনিকের সংখ্যা ৮৮।

যুদ্ধের একদিন পর্যন্ত হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তার সাথিদের মৃতদেহ ময়দানে পড়ে থাকে। পরের দিন তাদের দাফন করে গাদিরিয়াবাসী।

ইবনু যিয়াদের দরবারে হুসাইনের মাথা

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তার সাথিদের খণ্ডিত মাথা নিয়ে কুফার দিকে রওনা হয় খাওলি ইবনু ইয়াযিদ ও হুমাইদ ইবনু মুসলিম। তারা ইবনু যিয়াদের দরবারে
পৌঁছে। সেখানে রাখে তাদের মাথাগুলো।

ইবনু যিয়াদ সাথে সাথে লোকজন জড়ো করে। খণ্ডিত মাথাগুলো সকলের সামনে রাখে। তার হাতে তখন একটি ছুরি ছিল। এটি দিয়ে এ পাপিষ্ঠ হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঠোঁটে খোঁচাতে থাকে।

যাইদ ইবনু আরকাম রাযিয়াল্লাহু আনহু সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। এ দৃশ্য দেখে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি। হবনু যিয়াদকে লক্ষ্য করে বলেন, 'হে ইবনু যিয়াদ, এ পবিত্র মুখ থেকে তোমার হাতের ছুরিটি সরাও। কসম সেই রবের, যিনি ছাড়া কোনো রব নেই-আমি নিজে আল্লাহর রাসুলকে এ ঠোঁটে চুমু খেতে দেখেছি।'

এটুকু বলেই কাঁদতে থাকেন যাইদ ইবনু আরকাম।

ইবনু যিয়াদ তাকে লক্ষ্য করে বলে, 'তুমি বুড়ো না হলে এখনই আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতাম।'

যাইদ ইবনু আরকাম প্রচণ্ড ভারাক্রান্ত হয়ে বেরিয়ে আসেন সেই মজলিস থেকে। জনসম্মুখে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দেন-

'হে আরবের লোকেরা, তোমরা জান্নাতি নারীদের নেত্রী ফাতিমার কলিজার টুকরো সন্তানকে শহিদ করে দিয়েছ। আর মারজানার পুত্রকে বানিয়েছ তোমাদের নেতা! তোমাদের মধ্যে ভালো যারা আছে, তাদের সবাইকে সে এক এক করে হত্যা করে ফেলবে। আর বদগুলোকে বানাবে গোলাম। তোমাদের কী হলো, তোমরা এখনো এ অপমান ও লাঞ্ছনাকে মেনে বসে আছ!' [আল- কামিল ফিত তারিখ, খন্ড:৩, পৃষ্ঠা :১৮৫;তারিখুল তাবারি, খন্ড:৫,পৃষ্ঠা :৪৫৬]

নবি-পরিবারের সাথে ধৃষ্টতা

দুইদিন পর। নবি-পরিবারের বাকি সদস্য এবং হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও বোনকে সাথে নিয়ে কুফার উদ্দেশে রওনা করে উমার ইবনু সাদ।

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তার সাথিদের মৃতদেহগুলো তখনো ময়দানে পড়ে ছিল। নারী ও শিশুরা এগুলো দেখে শোকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কান্নায় ভেঙে পড়ে তারা। তাদের সাথে একাত্ম হয়ে কাঁদতে থাকে আকাশ ও পৃথিবী।

উমার ইবনু সাদ তাদের সবাইকে ইবনু যিয়াদের সামনে উপস্থিত করে। হুসাইনের বোন যাইনাব তখন প্রচণ্ড ক্লান্ত ও ধূলোমলিন। সফরের ধকলে তার পরনের পোশাক বেশ ময়লা ও নোংরা হয়ে গেছে। তাকে ঘিরে আছে তার বাঁদিরা। যাইনাব তাদের সাথে একদিকে গিয়ে বসে পড়েন।

দৃশ্যটি ইবনু যিয়াদের চোখে পড়ে। তাই সে জিজ্ঞেস করে, একটু দূরে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকা ওই নারীটি কে?'

যাইনাব নিশ্চুপ। কয়েকবার জিজ্ঞেস করার পরও তার কোনো সাড়া নেই।

তখন একজন বাঁদি বলে ওঠে, 'তিনি ফাতিমার কন্যা।'

ইবনু যিয়াদ তখন বলে, 'আল্লাহর প্রশংসা করি, যিনি তোমাদের অপদস্থ করেছেন, হত্যা করেছেন। মিথ্যা সাব্যস্ত করেছেন তোমাদের কথাকে।'

তার এ কথা শুনে গর্জে ওঠেন যাইনাব। বলেন, 'আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া, যিনি আমাদের নবি-বংশে পাঠিয়ে সম্মানিত করেছেন। কুরআনি ঘোষণার মাধ্যমে পবিত্র করেছেন আমাদের। অপদস্থ তো তারা, যারা আল্লাহর নাফরমানি করে।'

রেগে যায় ইবনু যিয়াদ। বলে, 'আল্লাহ তোমাদের ক্রোধ থেকে আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। মিটিয়ে দিয়েছেন তোমাদের চক্রান্ত।'

যাইনাবের বুক ভারী হয়ে আসে। কাঁদতে থাকেন তিনি। ইবনু যিয়াদকে লক্ষ্য করে বলেন, 'তুমি আমাদের ছোট-বড় সবাইকে শহিদ করেছ। যদি এটাই তোমার কাছে আমাদের থেকে মুক্তি পাওয়া হয়ে থাকে, তবে তাই হোক!'

এবার ইবনু যিয়াদের চোখ পড়ে আলি আসগরের দিকে। তার নাম জিজ্ঞেস করে।

আলি আসগর বলেন, 'আমার নাম আলি।'

ইবনু যিয়াদ বলে, 'তাকে তো হত্যা করা হয়েছে।'

আলি আসগর বলেন, 'তিনি আমার বড় ভাই। তার নামও আলি।'

আলি আসগরকেও হত্যার ইচ্ছা করে ইবনু যিয়াদ। আলি আসগর বুঝতে পেরে বলেন, 'আমি না থাকলে এ পরিবারের দায়িত্বশীল হবে কে!'

যাইনাব রাযিয়াল্লাহু আনহা বুঝে ফেলেন ইবনু যিয়াদের মনের কুবাসনা। খেদিত কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'ইবনু যিয়াদ, এখনো কি তোমার রক্তপিপাসা মেটেনি? আমিতোমাকে আল্লাহর শপথ করেবলছি-যদি তুমি আলি আসগরকে হত্যা করে তাহলে তার সাথে আমাদেরও মেরে ফেলো!'

এবার ইবন যিয়াদকে লক্ষ্য করে আলি আসগর বলেন, 'যদি তোমার ও ৪ সম্মানিতা নারীদের ভেতর কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে, তবে তাদের সাথে কোনো সৎ ও মুত্তাকি মুসলিমকে পাঠাবে। যাতে সে ইসলামি রীতিমতো তাদের সাথে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করে।'

এটুক শুনে ইবন যিয়াদ বলে, 'আচ্ছা, ছেলেটাকে ছেড়ে দাও। সে নিজেই। পরিবারের নারীদের সঙ্গী হয়ে যাক।'

এর মধ্যে সালাতের সময় হয়ে যায়। ইবনু যিয়াদ সালাতের পর সকলের উদ্দেশে একটি ভাষণ দেয়। সেই ভাষণে সে আলি ও হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুমাকে গালমন্দ ও অপমান করে।

আব্দুল্লাহ ইবনু আফিফ আল-আযদি উপস্থিত ছিলেন মজলিসে। তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। সবসময় মসজিদে থাকেন। ইবনু যিয়াদের কথা শুনে জোশের সাথে দাঁড়িয়ে যান। বলে ওঠেন, 'ইবনু যিয়াদ, তুমি মিথ্যুক! তোমার বাপও মিথ্যুক। তুমি নবির উত্তরসূরিদের হত্যা করো, আবার সত্যবাদী সেজে কথা বলো।'

তাকে বন্দি করতে চায় ইবনু যিয়াদ। কিন্তু তার গোত্রের লোকেরা বাধা দিতে আসে তাই তাকে বন্দি না করে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ইয়াযিদের দরবারে হুসাইনের মাথা

পাপিষ্ঠ ইবনু যিয়াদের মনের খেদ তখনো মেটেনি। সে নির্দেশ দেয়, 'হুসাইনের মাথাকে একটি লাঠির অগ্রভাগে গেঁথে নাও। তারপর এটি নিয়ে কুফার বাজারে আর অলিগলিতে ঘুরে বেড়াও। যাতে সবাই দেখতে পারে।'

এ জঘন্য কাজটা করার পর ইবন যিয়াদ হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার সাথিদের মাথাগুলোকে সিরিয়ায় ইয়াযিদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। সাথে পাঠানো হয় নবি-পরিবারের নারী ও শিশুদেরকেও।

যাহরা ইবনু কাইস তাদেরকে নিয়ে সিরিয়ায় পৌঁছে। সে তাদেরকে ইয়াযিদের দরবারে পেশ করে উপহার বাগিয়ে নিতে চেয়েছিল। তাই তাদেরকে নিয়ে দ্রুত উপস্থিত হয়।

হুট করে তার আসার কারণ জানতে চান ইয়াযিদ। যাহরা ইবন কাইস তার কাছে কারবালা যুদ্ধের সবিস্তার বিবরণ তুলে ধরে। বলে, 'আমিরল মুমিনিন, সুসংবাদ গ্রহণ করুন-আমাদের বিজয় হয়েছে। মারা গেছে হুসাইন ও তার বাহিনী। তাদের নারী ও শিশুরা আপনার দরবারে হাজির।'

বিবরণ শুনে ইয়াযিদের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। প্রচণ্ড ভারাক্রান্ত হয়ে সে বলে ওঠে, 'আমি তো তোমাদেরকে বলিনি, তাকে হত্যা করো। আমি কেবল তাকে বন্দি করতে চেয়েছিলাম। সুমাইয়ার পুত্রের ওপর আল্লাহর অভিশাপ, সে-ই সৈন্য লেলিয়ে দিয়ে তাদের হত্যা করিয়েছে! আল্লাহর কসম, আমি সেখানে থাকলে তাদের ক্ষমা করে দিতাম। আল্লাহ তাআলা হুসাইনের ওপর দয়া করুন!

এটুকু বলে চুপ হয়ে যায় ইয়াযিদ। যাহরা ইবনু কাইসকে কিছুই দেয়নি।

এবার ইয়াযিদের সামনে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর খণ্ডিত মাথা রাখা হয়। তখন তার হাতে ছিল একটি ছড়ি। সে এ ছড়িটি হুসাইনের দাঁতে ঠেকায়, তারপর হুসাইন ইবনু হাম্মামের এ কবিতাগুলো আবৃত্তি করে-

গোত্র আমার করেছে জুলুম আমার নিজের সাথে

রক্তক্ষুধিত তরবারি তাই জবাব দিয়েছে ঘা-তে!

ধুলোয় মেখেছে মস্তক শত হুমকির ছিল যারা

শোষিতরা ছিল বন্ধন কাটা, জালিম এমন ধারা!

আবু বারযা আল-আসলামি রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইয়াযিদকে লক্ষ্য করে বলেন, 'হে ইয়াযিদ, তুমি হুসাইনের দাঁত থেকে তোমার ছড়িটি সরাও। তুমি যেখানে ছড়ি ঠেকিয়ে রেখেছ, আমি আল্লাহর রাসুলকে সেখানে চুমু খেতে দেখেছি। শোনো ইয়াযিদ, কিয়ামতের দিন তুমিও উত্থিত হবে; উত্থিত হবেন হুসাইনও। তখন তোমার সুপারিশকারী হবে ইবনু যিয়াদ। আর হুসাইনের সুপারিশকারী হবেন স্বয়ং আল্লাহর রাসুল।'

এটুকু বলেই আবু বারযা রাযিয়াল্লাহু আনহু সেই মজলিস থেকে বেরিয়ে যান।[আল-কামিল ফিত তারিখ, খন্ড:৩,পৃষ্ঠা :১৮৭-১৮৮:তারিখুল তাবারি,খন্ড:৫,পৃষ্ঠা :৪৫৯-৪৬০]

প্রাসাদজুড়ে শোকের মাতম

ইয়াযিদের স্ত্রী হিন্দ বিনতু আব্দিল্লাহ যখন জানতে পারে-হুসাইন রাযিয়াল্লা আনহুকে শহিদ করা হয়েছে। তার খণ্ডিত মাথাও নিয়ে আসা হয়েছে সিরিযায়। তখন খুব ব্যস্ত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।

ইয়াযিদকে লক্ষ্য করে বলে, 'আমিরুল মুমিনিন, সত্যিই কি আল্লাহর রাসূলের দৌহিত্রের সাথে এমনটি করা হয়েছে?'

ইয়াযিদ বলে, 'হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা ইবন যিয়াদকে ধ্বংস করুন। সে তাড়াহুড়া করতে গিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলেছে!'

এটুকু শুনেই কান্নায় ভেঙে পড়ে হিন্দ।

ইয়াযিদ বলে, 'হুসাইন বলেছিলেন-আমার পিতা ইয়াযিদের পিতা থেকে, আমার মা ইয়াযিদের মা থেকে আর আমার নানা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াযিদের নানা থেকে উত্তম।

তার প্রথম দাবি যেটা ছিল, আমার পিতা থেকে তার পিতা উত্তম। এর বিচার তো এখন আল্লাহই করবেন। তারা দুজনই তার কাছে চলে গেছেন। তিনিই জানে, তার ফয়সালা কার পক্ষে গেছে। তার দ্বিতীয় দাবি ছিল, তার মা আমার মা থেকে উত্তম। আমি কসম করে বলি, এতে কোনো সন্দেহ নেই; প্রকৃতপক্ষেই তার মা ফাতিমা আমার মা থেকে উত্তম। তার তৃতীয় দাবি ছিল, তার

নানা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নানা থেকে উত্তম। এটি এমন বিষয়, যাকে মুসলিমমাত্রই স্বীকার করে নিতে বাধ্য-যদি আল্লাহ ও বিচার দিবসের প্রতি কারও বিশ্বাস থেকে থাকে।

তার সব দাবিই সঠিক ছিল। কিন্তু যে বিপদ এসেছে, সেটা তার ব্যক্তিগত বুঝের কারণে। তিনি এ আয়াতে গভীর দৃষ্টিপাত করেননি-

قُلِ اللَّهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاء. ُ

বলুন, হে আল্লাহ, রাজত্বের মালিক-আপনি যাকে ইচ্ছা, রাজত্ব দান করেন আর যার থেকে ইচ্ছা, রাজত্ব ছিনিয়ে নেন। [সূরা আলে-ইমরান, আয়াত :২৬]

এরপর নারী ও শিশুদের তার সামনে আনা হয়। হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর খণ্ডিত মাথা সেখানেই রাখা ছিল। হুসাইনের দুই মেয়ে ফাতিমা ও সুকাইনা পিতার মুখটি দেখতে ছটফট করছিলেন। ইয়াযিদ হুসাইনের মাথার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল যেন মেয়েদুটি পিতার মুখ দেখতে না পারে।

একবার যখন কোনোরকমে তাদের দৃষ্টি পিতার খণ্ডিত মাথার ওপর গিয়ে পড়ে, তখনই শব্দ করে কান্না বেরিয়ে আসে ভেতর থেকে। তাদের আওয়াজের সাথে একাত্ম হয়ে ওঠে ইয়াযিদের অন্দরমহলের নারীদের আওয়াজ। শোকের আবহ নেমে আসে গোটা প্রাসাদজুড়ে। [আল-কামিল ফিত তারিখ, ইবনুল আসির, খন্ড:৩, পৃষ্ঠা :১৮৮-১৮৯]

হুসাইন-পত্নীর শোক ও মৃত্যু

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর সম্মানিত স্ত্রী রবাব বিনতু ইমরাইল কাইস। এ সফরে তিনি স্বামীর সঙ্গী ছিলেন। নবি-পরিবারের সদস্যদের সাথে তাকেও সিরিয়াসা পাঠানো হয়। সেখান থেকে তাদের সাথে মদিনায় চলে আসেন। জীবনের বাকি দিনগুলো তিনি কাটিয়ে দেন অন্দরমহলে। কখনো ঘর থেকে বের হননি।

অনেকে তাকে পরামর্শ দিতেন, 'আরেকটি বিয়ে করে নিন।'

তিনি উত্তর দিতেন, 'আমি আল্লাহর রাসুলের পর আর কাউকে নানা শ্বশুর হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি নই।'

প্রিয়তম স্বামীর শোকে তিনি একেবারে মুষড়ে পড়েন। এক বছর পরই এ মহীয়সী নারী ইন্তেকাল করেন।

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার সাথিদের শাহাদাতের সংবাদ মদিনায় পৌঁছলে সবখানে নেমে আসে শোকের ছায়া। মদিনাবাসীর কেউ শোকে স্তম্ভিত হয়ে যায়, কেউ আকুল হয়ে কাঁদে। মদিনার ইট-কাঠও যেন তাদের সাথে শোক পালন করতে থাকে। তারপর যখন নবি-

পরিবারের বাকি সদস্য মদিনা পৌঁছান, তখন তাদের দেখে আরও তাজা হয়ে ওঠে এ জখম। [আল-কামিল ফিত তারিখ, খন্ড :৩,পৃষ্ঠা:১৯১]

বায়ুমণ্ডলে শাহাদাতের প্রভাব

ইতিহাসবিদ ইবনুল আসির লেখেন-

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পর দু-তিন মাস পর্যন্ত প্রকৃতিতেও ছিল এ শাহাদাতের প্রভাব; যা খালি চোখে দেখা যেত।

যখন সূর্যাস্ত হতো, তখন অস্তাচলে লেপটে থাকা আবির দেখে মনে হতো-সেখানে যেন লেগে আছে ছোপ ছোপ রক্ত। আবার যখন সূর্যোদয় হতো, দেয়ালে দেয়ালে ছড়িয়ে পড়ত কিরণ; তখন মনে হতো-দেয়ালজুড়ে যেন রক্তের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। [আল-কামিল ফিত তারিখ,খন্ড:৩,পৃষ্ঠা :১৯৩]

হুসাইনের বৃত্তান্ত ও মর্যাদা

৫ শাবান, চতুর্থ হিজরিতে মদিনা মুনাওয়ারায় আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু ও ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘরে পৃথিবীর আলো দেখেন হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু। আর ১০ মুহাররম, ৬১ হিজরিতে কুফার কারবালা প্রান্তরে শাহাদাতবরণ করেন। তখন তার বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর।[আল -কামিল ফিত তারিখ, খন্ড:৩,পৃষ্ঠা:১৯৩]

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্মের পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তাহনিক করান। নিজে খেজুর চিবিয়ে সেই মুবারক লালামিশ্রিত খেজুর তার মুখে পুরে দেন। কানে আজান দেন। প্রাণখুলে দুআও করেন তার জন্য। এরপর নবিজি প্রিয় নাতির নাম রাখেন- হুসাইন। জন্মের ঠিক সপ্তম দিনের মাথায় নবিজি সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার আকিকা করান।(সহিহ ইবন হিব্বান :৫৩১১; বর্ণনাটি হাসান)

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু নবিজির কোলে, তার চোখের সামনে বেড়ে ওঠেন। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান এবং সাহসী। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ব্যাপারে বলেন, 'হুসাইন আমার অংশ আর আমি হুসাইনের অংশ। হে আল্লাহ, যে হুসাইনকে ভালোবাসবে, আপনিও তাকে ভালোবাসুন। '(সুনানুত তিরমিযি:৩৭৭৫; বর্ণনাটি হাসান।বর্ণনাকারী হলেন ইয়ালা ইবনু মুররা রাযিয়াল্লাহু আনহু)

ইবনু হিব্বান, ইবনু সাদ, আবু ইয়ালা ও ইবনু আসাকির প্রমুখ মুহাদ্দিস জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে একটি হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুলকে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি জান্নাতি কাউকে দেখতে চায় (অথবা বলেছেন) জান্নাতি যুবকদের নেতাকে দেখতে চায়, সে যেন হুসাইনকে দেখে নেয়। [সিয়ারু আলামিন নুবালা,খন্ড:৪,পৃষ্ঠা :৩৪৯-৩৫০;আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খন্ড:৮, পৃষ্ঠা:২০৬]

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন-আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার মসজিদে এসে বলেন, 'সবসময় হাসিখুশি থাকা ছেলেটি কোথায়?'

হুসাইন দৌড়ে এসে আল্লাহর রাসুলের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পরক্ষণেই আল্লাহর রাসুলের দাড়িতে আঙুল ঢুকিয়ে খেলা করতে থাকেন তিনি।

আল্লাহর রাসুল তখন হুসাইনকে চুমু খেয়ে বলেন, 'হে আল্লাহ, আমি হুসাইনকে ভালোবাসি; আপনিও তাকে ভালোবাসুন। আর তাকেও ভালোবাসুন, যে হুসাইনকে ভালোবাসবে।' [মুসনাদে আহমদ :১০৮৯১; আল-আদাবুল মুফরাদ : ১১৮৩ ;হাদিসটি হাসান। বর্ণনাটি হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কিত, হুসাইন সম্পর্কিত নয়]

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু একদিন বাইতুল্লাহর ছায়ায় বসে ছিলেন। তখন সামনের দিক থেকে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আসতে দেখেন। তাকে দেখেই তিনি বলে ওঠেন, 'এ যুগের এ লোকটি আসমানবাসীর কাছে গোটা দুনিয়ার যে কারও থেকে বেশি প্রিয়।' [সিয়ারু আলামিন নুবালা, খন্ড :৩,পৃষ্ঠা :২৮৫ ;আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খন্ড :৮,পৃষ্ঠা :২০৭]

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু স্বভাবত অত্যধিক দানশীল ছিলেন। মানুষকে উপকার ও সহায়তা করতে তার হাতে যা থাকত, সবই অকাতরে দান করে দিতেন।

হুসাইনের সোনালি উপদেশ

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সাথিসঙ্গী ও অনুসারীদের সবসময় উপদেশ দিতে গিয়ে এটা বলতেন, 'যখন কোনো মানুষ তোমার কাছে এসে তাদের প্রয়োজনের কথা বলবে, তখন তাদের কথা শুনতে গিয়ে ক্লান্ত হবে না। এই যে তোমাকে তাদের প্রয়োজন হচ্ছে, এটা তোমার প্রতি আল্লাহ তাআলার নিয়ামত। যদি তুমি তাদের এ প্রয়োজনের কথা শুনতে গিয়ে বিরক্ত হয়ে পড়ো, তবে এ নিয়ামতের মুদ্রা উলটে যাবে। অর্থাৎ তোমাকে তখন মানুষের মুখাপেক্ষী করে দেওয়া হবে। তুমি তাদের দরজায় গিয়ে চাইবে।' [সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, খন্ড : ১১,পৃষ্ঠা : ৭৮]

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু একদিন বাইতুল্লাহর প্রাঙ্গণে হাজরে আসওয়াদ আঁকড়ে ধরে দুআ করছিলেন, 'হে আল্লাহ, আপনি আমাকে যথাযথভাবে নিয়ামত দান করেছেন; কিন্তু আমাকে কৃতজ্ঞ পাননি। আমাকে পরীক্ষা করেছেন; কিন্তু ধৈর্যশীল পাননি। তারপরও আপনি আমাকে অফুরান নিয়ামতে ডুবিয়ে রেখেছেন। কোনো বিপদও ঘেঁষতে দেননি আমার কাছে। হে আল্লাহ, আপনি পরম দয়াশীল। আর দয়াশীলের কাছ থেকে এমন দয়াই প্রত্যাশিত।'

পরিণত বয়সে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সম্মানিত পিতা আলি রাযিয়াল্লাহ আনহুর সাথে কুফা চলে যান। তার সাথে অনেকগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। পিতার সান্নিধ্যে পার করেন জীবনের অনেকটা সময়।

৪০ হিজরিতে আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাত বরণ করেন। তখন খিলাফতের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে। তিনি কিছুদিন এ দায়িত্ব পালন করে নিজ থেকেই তা মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে অর্পণ করে দেন। প্রাসাদজীবন ছেড়ে চলে আসেন মদিনায়।

পিতার শাহাদাতের পর হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু তার ভাইয়ের সাথে ছিলেন।
তারপর তার সাথে তিনিও চলে আসেন মদিনায়। এখানে অবস্থান করেন। এরপর ইয়াযিদের হাতে বাইআতের ফিতনা চালু হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি মদিনায় ছিলেন।

কারবালা প্রান্তরে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু শহিদ হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করুন।

ধ্বংস হলো ইয়াযিদ

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পর একটা দিনের জন্যও শান্তিতে থাকতে পারেনি ইয়াযিদ। পুরো মুসলিম বিশ্বে উচ্চকিত হয় শহিদদের পবিত্র রক্তপণ আদায়ের বিষয়টি। একে কেন্দ্র করে শুরু হয় বিদ্রোহ।

এরপর আর বেশি দিন বাঁচেনি ইয়াযিদ। এক বর্ণনামতে ২ বছর আট মাস, আরেক
বর্ণনামতে ৩ বছর ৮ মাস নিজের ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে ছিল সে। তারপরই তার এই ক্ষণস্থায়ী ও কলঙ্কময় শাসনামলের অবসান হয়। আল্লাহ তাআলা তাকে পৃথিবীতে লাঞ্ছিত করেন। অপদস্থ হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় সে।[আলা-কামিল ফিত তারিখ, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা : ২২২]

হুসাইনের শাহাদাতের মূল লক্ষ্য

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার সাথিদের আত্মত্যাগের মূল লক্ষ্য ছিল-

» কুরআন ও সুন্নাহর বিধিবিধানকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা।

> ইসলামের ইনসাফপূর্ণ শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

> নববি পদ্ধতির খিলাফতের পরিবর্তে রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মোকাবেলায় অবিরাম জিহাদ চালিয়ে যাওয়া।

> সত্যের বিপরীতে কোনো পরাশক্তির সামনে মাথা নত না করা।

> সত্যের পথে প্রয়োজনে নিজের জীবন, ধনসম্পদ ও পরিবার-পরিজনকে উৎসর্গ করে দেওয়া।

> ভীষণ বিপদে ঘাবড়ে না যাওয়া; মনোবল ধরে রাখা।

> সবসময় আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা, তাঁরই ওপর ভরসা করা। ভালোমন্দ যা-ই ঘটুক, তাতে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করা।

আফসোস তাদের জন্য-এত কিছুর পরও যারা তার অবস্থান ও আত্মত্যাগকে ক্ষমতা লাভ বা পার্থিব প্রাপ্তির 'সামান্য পদক্ষেপ' বলে আখ্যা দেয়।

[টপিক:(হুসাইনের বিরুদ্ধে ইবনু যিয়াদের প্রস্তুতি থেকে হুসাইনের শাহাদাতের মূল লক্ষ্য) কারবালার প্রকৃত ইতিহাস বই থেকে সংগৃহিত]

কিছু কথা

নবি পরিবারের প্রতি ভালোবাসা রাখা ঈমানের অংশ।তাদের উপর যে বর্বোচিত অত্যাচার চালানো হয়েছে, এটা কখনও ভুলবার নয়। হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তার সাথীদের হৃদয়বিদারক শাহাদাত যাদের হৃদয়ে বেদনার দাগ কাটে না - তারা মুসলিম তো নয়ই ;মানুষ ও নয়।

কিন্তু তিনি এবং তার সাথিদের প্রতি সহমর্মিতা ও শোকপ্রকাশের বিষয়টি এমন নয় , সারা বছর হাসি-আনন্দে কাটিয়ে কেবল মুহাররমের ১০ তারিখ এলেই কারবালার ঘটনা মনে করে কাঁদতে হবে, মাতম করতে হবে।

মৃত ব্যক্তিদের জন্য শোক প্রকাশার্থে মুখে আঘাত করা, বুক চাপড়ানো, জামা ছিড়ে ফেলা, চিৎকার করা, বিলাপ কার, মাতম করা এই কাজগুলো ইসলামে নিষিদ্ধ।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ(রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যারা (মৃত ব্যাক্তির জন্য শোক প্রকাশে) গালে আঘাত করে, জামার বুক ছিড়ে ফেলে এবং জাহেলী যুগের মতো চিৎকার করে তারা আমাদের দল ভুক্ত নয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস ১২৯৪)

আশুরা আসলেই কারবালার স্মরণে শিয়া সম্প্রদায়েরা শোক প্রকাশের অনুষ্ঠানে উপরের হাদীসে উল্লিখিত প্রায় সবগুলো কাজই তারা করে থাকে। এ কাজগুলো শিয়ারা বছরের পর বছর ধরে করে আসছে। যেগুলো আমাদের ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয় অথচ তারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করে।

কোনো বিপদ-আপদ বা শোককে জিইয়ে রেখে দিনের পর দিন স্মরণ করা ইসলামের রীতি নয়। মৃত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশের ক্ষেত্রে ইসলাম সর্বোচ্চ তিন দিন শোক প্রকাশের অনুমোদন করে। শুধু স্ত্রীর জন্য স্বামীর মৃত্যুতে ইদ্দত পর্যন্ত (গর্ভবতী হলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত অন্যথায় ৪ মাস ১০ দিন) শোক প্রকাশের বিধান রেখেছে। পক্ষান্তরে শিয়া সম্প্রদায় ইসলামের সকল মূলনীতির বিরুদ্ধে গিয়ে হযরত হুসাইন রা. এর শাহাদাত ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের শাহাদাতের দিনকে মাতমের দিন বানিয়ে ফেলেছে।

কোনো একটি দুঃখজনক ঘটনার স্মরণে যদি মাতম করা ও বছরের পর বছর ওইদিনে মাতম করা জয়েজ হত, তাহলে নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের দিনটিকেই তো

সর্বাগ্রে মাতমের দিন বানানো হত। আবু বকর, উসমান,উমর, আলী রাযিআল্লাহু আনহুম ওনাদের ইন্তিকালের দিনেও মাতম করা হত। দেখা যেত পুরো বছর জুড়েই মুসলিমদের কারো না কারো জন্য মাতম চলছে।

শিয়াদের এসব অনৈসলামিক কাজকর্ম শুরু হয় মুহাররম মাসের চাঁদ দেখা যাওয়ার পর থেকে। ড্রাম বা ঢোল জাতীয় বাদ্যযন্ত্র বাজায়, কালো পোশাক পরে, শীরিরে লোহার শিকল পরে, এবং শোকের র‍্যালী বের করে। লোহার বড় বড় চাকু দিয়ে শরিরে পিঠে আঘাত করে, হাত দিয়ে বুক আঘাত করে এবং সবাই সমস্বরে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর নাম নিতে থাকে।

শুধু শিয়া রাষ্ট্র গুলোই নয় বর্তমানে বহু মুসলিম দেশে ও এসব তাজিয়া মিছিলের বের হতে দেখা যায় । এমনকি বাংলাদেশেও বিষেশত পুরাণ ঢাকায় তাজিয়া মিছিলের দেখা যায়। মিছিলে তারা এসব অনৈসলামিক কাজগুলো করে থাকে।এবং মিডিয়া গুলোও ঢালাও ভাবে এর প্রচারণা করতে থাকে।

কারবালা সম্পর্কিত এ সকল ধরনের অনৈসলামিক কাজ থেকে মানুষদের বিরত থাকার জন্য দরকার কারবালার সঠিক ইতিহাস জানা ও অন্যদেরকে জানানো। এবং তারা যেসকল কাজ গুলো করে থাকে তার কোনো ভিত্তি ইসলামে নেই, একথাগুলো ধৈর্যের সাথে তাদেরকে বুঝানো।

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকে অনৈসলামিক সকল ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার তৌফিক দান করুন।

উপসংহার

জান্নাতি যুবকদের নেতা, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৌহিত্র হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু।নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নয়নমণি, কলিজার টুকরো।

হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নববি আদর্শ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রাণ দিতে হয়েছে মুসলিম নাম ধারী একদল পাপিষ্ঠের হাতে। চোখের সামনে আপন পরিবারের নির্মম মৃত্যু, ফুরাতের কুলকুল জলধারা থাকে সত্ত্বেও আপন ছেলের তৃষ্ণা মিটাতে না পারা এক কঠিনতম বেদনা।

কারবালার হত্যকান্ড কোনো সাধারণ হত্যাকান্ড বা কোনো আখ্যান নয় -এর বাস্তবতা এত মর্মান্তিক ও হৃদায়বিদারক, যা পৃথিবীর সমস্ত নৃশংসতা ও পাশবিকতাকে হার মানায়। ফলে হাজার বছর পেরিয়া গেলেও এ ঘটনা মুসলিমদের হৃদয়ে বেদনার রক্তক্ষরণ ঘটায়।
আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দুআ করি - হে আল্লাহ, আপনি আমাদের হৃদয়ে আপনার প্রতি, আপনার প্রিয় রাসূলের, তার সাহাবিগন ও পরিবারের প্রতি ভরপুর মহব্বত ঢেলে দিন।

(নোট: আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে ইসলামের এতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে থিসিস করার, ও কিছু লিখার তৌফিক দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ । আমার ভুলত্রুটি গুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য অনুরোধ করা হলো।)